লগ্নপাতি

সমরেশ বসু

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ ঃ
বৈশাখ ১৩৭১
এপ্রিল, ১৯৬৪

প্রকাশক ঃ
ব্রজকি[illegible]কাশনী
৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক ঃ
গোপালচন্দ্র রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস
৬, শিবুবিশ্বাস লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
গৌতম রায়

হ্যাখো রামকান্ত—'

'আমার নাম রামকান্ত নয় স্যার।'

'বেশ রামকান্ত নয়, রামনাথই হল।' বিশ্বামিত্র বললেন।

'মোটেই না স্যার। আমার নাম রামকুমার।' রামকুমার যার নাম, সে যদিও আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য, তার স্বর ভেসে আসছে ই স্বল্প-পরিসর ঘরটির মাঝখানে টাঙানো পর্দার আড়ালে, ঘরের একটি কোণ থেকে।

বিশ্বামিত্র, যে ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে, কোনরকমে যাতায়াতের সরু একফালি জায়গা রেখে, একটি তক্তপোশ পাতা, তার ওপর বসে আছে। তক্তপোশের ওপর মাছুর পাতা। বিশ্বামিত্রর সামনে একটি ছোট জলচৌকি, নামাবলীর কাপড় দিয়ে সেটি আপাদমস্তক ঢাকা। তার একপাশে কিছু পাকানো মোড়ক দেখলে বোঝা যায়, ওগুলো কোষ্ঠী। পাঁজি এবং সাল-তারিখ গণনার অন্যান্য কিছু বইও রয়েছে। জলচৌকির ওপর একটি ছক পাতা। পাশে একটি আই-গ্লাসও রয়েছে। আই-গ্লাস চাপা দেওয়া, আনুমানিক তিরিশ চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ টাকার নোট।

ঘরটিকে একটি সরু গলি বলা যায়। পিছন দিকে একটি জানালা আছে, এখন সেটি বন্ধ। কিন্তু দেওয়ালে দুটি ছবি রয়েছে। অনেকটা মুনি-ঋষিদের মত। একটির তলায় লেখা আছে পরাশর। আর একটির তলায়, ভৃগু। চিত্রকর কী করে পরাশর আর

ভৃগু মুনির চিত্র আঁকতে পারে, এ প্রশ্ন অবান্তর, কেন না, মহাভারতের অনেক চরিত্রের চিত্রই, চিত্রকরেরা নিজেদের কল্পনা মত এঁকে থাকেন। বিশ্বামিত্রর বয়স ত্রিশোর্ধ্ব মনে হয়। মেদ-বর্জিত ঋজু দীর্ঘ শরীর, এমন কিছু কোমল বা সৌম্যকান্তি তাকে বলা যায় না, কিন্তু তার বড় চোখ দুটিতে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য আছে, দেখলে মনে হয়, তা হঠাৎ কখনো গভীর, স্নিগ্ধ অথচ বিষণ্ণও হয়ে উঠতে পারে। আপাতত তার বুদ্ধির দীপ্তিতে একটু যেন ব্যাকুল চাতুর্য ঝিলিক দিচ্ছে। তার কপাল চওড়া, চোখা নাক, দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট। গরুয়া পাঞ্জাবি, খাদির পাড়বিহীন ধুতি পরনে। একটি দামী সিগারেটের প্যাকেট জলচৌকির নিচে, তক্তপোশের ওপর। তার সামনের দরজায় একটি পর্দা টাঙানো, ঝাপসাভাবে রাস্তা দেখা যাচ্ছে, এবং চলমান জনতা ও যানবাহন, শব্দ ভেসে আসছে।

বিশ্বামিত্র দামী প্যাকেটটি খুলে একটি অতি সস্তা দামের সিগারেট বের করে বলল, 'ওই হল। কান্ত নাথ কুমার, সবই এক।'

পর্দার আড়াল থেকে প্রতিবাদ শোনা গেল, 'মোটেই না স্যার। আপনি অশোকনাথ বলতে পারেন, বা দিলীপকান্ত? এমন কি উত্তমনাথ বা কান্ত? লোকে আপনাকে তেড়ে মারতে আসবে। কুমার ইজ কুমার।'

বিশ্বামিত্র বলে উঠল, 'আরে ধুত্তোরি কুমারের নিকুচি করেছে। তিনটে ক্লায়েন্ট আসবে বললে, একটারও পাত্তা নেই, খালি আমার সঙ্গে ভাঁওতা—'

দরজায় খট্-খট্, পর্দার ওপাশে একটি মানুষের মূর্তি, জিজ্ঞাসা, 'ভেতরে আসতে পারি?'

বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ গলাখাঁকারি দিয়ে, যেন আপন মনেই বলতে লাগল, 'ভৃগুজাতকের লক্ষণাদি—দিন ক্ষণ গ্রহ নক্ষত্রাদি—আমি মানশ্চক্ষে—'

'ভেতরে আসতে পারি?' আবার জিজ্ঞাসা।

বিশ্বামিত্র যেন চমকে উঠে, দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কে ? আসুন।'

একজন চল্লিশোর্ধ্ব ব্যক্তি ঢুকল। বেশ ঝকঝকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, দেখলেই বোঝা যায়, ভাল অবস্থার লোক। হাত তুলে নমস্কার করল। বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, কিছু জিজ্ঞেস করল না। লোকটি বলল, 'আপনি কি বিশ্বামিত্র চট্টোপাধ্যায় ?'

বিশ্বামিত্র ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'আমার নাম প্রণয়পুষ্প পাল।' লোকটি বলল।

বিশ্বামিত্র সিগারেটের প্যাকেটের পাশে নোট-বইটি দেখে বলল, 'ওহ্, আসুন, নমস্কার, বসুন। আপনার বোধহয় আরো আগেই আসার কথা ছিল।'

প্রণয়পুষ্প পাল তক্তপোশে বসে বলল, 'হ্যাঁ, একটু কাজে আটকে পড়েছিলাম।'

বিশ্বামিত্র একটু ব্যস্তভাবে জলচৌকির ওপর থেকে পাতা কোষ্ঠী এবং টাকা অন্যদিকে সরিয়ে রাখল। প্রণয়পুষ্প তখন ঘরের আশে পাশে কৌতূহলিত চোখে দেখছিল, বলল, 'মনে হল আপনি কারোর সঙ্গে কথা বলছিলেন, কিন্তু কারোকে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'কথা আপনি ঠিকই শুনেছেন, তবে কারোর সঙ্গে না। কাছে কেউ না থাকলে কোষ্ঠী দেখতে দেখতে আমি উচ্চস্বরে আলোচনা করি। কিন্তু কার সঙ্গে, দয়া করে তা জিজ্ঞেস করবেন না।'

ব'লেই সে দেওয়ালের ছবি দুটির দিকে একবার দেখে নিল। স্বভাবতই প্রণয়পুষ্পও দেখল, পরাশর আর ভৃগু। তার চোখ-মুখের অভিব্যক্তিতে ভক্তি আর বিশ্বাস। বিশ্বামিত্র জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কোষ্ঠীটি এনেছেন ?'

প্রণয়পুষ্প বলল, 'এনেছি।'

'দিন।' বিশ্বামিত্রর চোখ বোজা।

প্রণয়পুষ্প কোষ্ঠী জলচৌকির ওপর রাখল। বিশ্বামিত্র চোখ মেলে, অপলক দৃষ্টিতে প্রণয়পুষ্পর দিকে তাকাল। প্রণয়পুষ্পও তাকাল। বিশ্বামিত্র আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল, একটু হেসে বলল, 'আপনি আমার সন্ধান পেলেন কার কাছে?'

প্রণয়পুষ্প বলল, 'আমার এক বন্ধুর কাছে। সে দেখলাম আপনার বিষয়ে অনেক কিছু জানে। তার খুব বিশ্বাস আপনার ওপর।'

বিশ্বামিত্র আবার চোখ বুজল, চোখ মেলল আবার। বলল, 'আপনার কোষ্ঠীতে হাত দেবার আগেই মনে হচ্ছে, আপনি বৃশ্চিক লগ্নের লোক। রাশি কী, মীন তো?'

প্রণয়পুষ্প বিস্মিত এবং মুগ্ধ, বলল, 'হ্যাঁ।'

বিশ্বামিত্র হেসে জিজ্ঞেস করল, 'যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তাকে পান নি, ব্যক্তিজীবনে সেটা বোধহয় একটা বড় হতাশা ছিল, না?'

প্রণয়পুষ্প অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তা কি করে জানলেন?'

বিশ্বামিত্র চোখ বুজে একটু হাসল, আবার মুহূর্তেই দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তাকিয়ে বলল, 'তবে এখন যিনি আপনার স্ত্রী, তিনিও গৃহলক্ষ্মী, আপনি যতই এদিক-ওদিক করে বেড়ান।'

বলেই তৎক্ষণাৎ ভিন্ন স্বরে বলল, 'সরি, কিছু মনে করবেন না।'

প্রণয়পুষ্প বলল, 'না না, আপনার কাছে আবার মনে করবার কী আছে। আপনি তো আমার সবই জানেন দেখছি।'

বিশ্বামিত্র হেসে বলল, 'না না, এই তো জীবনে আপনার আমার প্রথম দেখা। তবে এদিক-ওদিক আপনাকে একটু টানাটানি করবে, ক্ষতি কিছু করতে পারবে না। সন্তান কী, দুই মেয়ে এক ছেলে?'

প্রণয়পুষ্প এত বিস্মিত, কথা বলতে পারল না, প্রায় হাঁ করে ঘাড় ঝাঁকাল।

বিশ্বামিত্র বলল, 'তাই অবিশ্যি মনে হচ্ছে। বয়স বোধ হয় বিয়াল্লিশ চলছে?'

প্রণয়পুষ্পর গলায় ভক্তি-বিশ্বাসের বাষ্প, বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, একচল্লিশ বছর ন' মাস চলছে।'

'তার মানে কার্তিক মাসে জন্ম। বেশ, এবার তা হলে আপনার কোষ্ঠীটা একটু দেখা যাক: দেখব আর কী, বৃহস্পতি তো দেখছি একাদশে, মঙ্গলও বেশ উজ্জ্বল। আপনি তো পিতৃহীন, কিন্তু মা বোধহয় বেঁচে আছেন।' যেন জবাবের প্রত্যাশা না করেই বিশ্বামিত্র বলল।

প্রণয়পুষ্প বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, মা বেঁচে আছেন।'

'হুম।' কোষ্ঠীর পাক খুলতে খুলতে বিশ্বামিত্র বলল, এবং আবার প্রণয়পুষ্পর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি যাঁর প্রেমে পড়ে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, তিনি আপনার থেকে উচ্চ বর্ণের ছিলেন কী?'

প্রণয়পুষ্প আবেগের সঙ্গে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কী করে জানলেন?'

'আপনাকে দেখে। সে বিয়ে না হয়ে ভালই হয়েছে। তিনি আপনাকে জীবনের অন্য দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারতেন, যেটা আপনার জীবন না। বোধহয় তাঁর লক্ষ্য অন্যদিকে, আপনার লক্ষ্য অনেকটাই সাদা। আচ্ছা, আপনার জীবিকা আমি জানি না, কিন্তু মনে হয়, তার সঙ্গে শ্বেতবর্ণের বস্তুর বিশেষ যোগাযোগ আছে।' বিশ্বামিত্র প্রণয়পুষ্পর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল।

প্রণয়পুষ্পর কপালে বিস্ময়ের রেখা, বলল, 'আমি কাগজের ব্যবসা করি।'

'কিন্তু খবরের কাগজ না, আপনি বোধ হয় এমনি কাগজের ব্যবসা করেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। আর আপনি যে আমার বিয়ের আগে কথা বললেন, সেটাও ঠিক। সেই মহিলা রাজনীতি করেন এখন। আমি সে পথে যেতাম না।'

বিশ্বামিত্র গম্ভীরভাবে বলল, 'মিলতেই হবে। আচ্ছা, আপনারা ক' ভাই ?

'পাঁচ ভাই, ছ বোন।'

'বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। আপনি চতুর্থ ভ্রাতা বোধহয় ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সবাই কি এক পরিবারে থাকেন ?'

'না, সবাই ভিন্ন।'

'আমারো তাই মনে হল। কিন্তু মনে হয়, আপনাদের ভাইয়েদের মধ্যে বিশেষ মনোমালিন্য নেই।'

'ঠিকই বলেছেন।'

'আপনাকে একটা কথা বলে দিই, আপনার মাকে বেশির ভাগ সময় নিজের কাছে এনে রাখবার চেষ্টা করবেন।'

বিশ্ব মিত্র এমনভাবে বলল, প্রণয়পুষ্প যেন সে আদেশ শিরোধার্য করে বলল, 'আজ থেকেই চেষ্টা করব।'

বিশ্বামিত্র প্রণয়পুষ্পর কোষ্ঠীতে মনোনিবেশ করল. এবং তার মধ্যেই বলল, 'আপনার জননীর ছায়ার স্পর্শও আপনার পক্ষে সর্বমঙ্গলকর। ছেলেবেলায় আপনাদের পরিবারের বেশ দারিদ্র্যদশায় কেটেছে, না ?'

প্রণয়পুষ্পর উত্তরোত্তর বিস্মিত চমক. 'হ্যাঁ।'

'আমার মনে হয়, আপনার সুদিনের সূচনা এখন থেকে বছর দশেক আগে হয়েছে।'

'আজ্ঞে ঠিকই বলেছেন।'

বিশ্বামিত্র কাগজ-কলম নিয়ে কোষ্ঠীর ছক আঁকতে আঁকতে বলল, 'আপনাকে আমি এখনই বলে দিচ্ছি, আপনার একজন কর্ম-

চারী সম্পর্কে একটু সাবধানে থাকবেন। আপনার ঝকঝকে কপালে একটি অতি সূক্ষ্ম ছায়া আমি দেখতে পেয়েছি।'

অবাক প্রণয়পুষ্প তার চিক্কণ কপালে হাত দিয়েই আবার নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সে আমার কিরকম ক্ষতি করতে পারে বলুন তো?'

'এমন কিছু না। আপনার প্রাপ্তিতে কোথাও সে বোধহয় ছায়ার মত কিছু ছোঁ মারবার চেষ্টা করে। কিন্তু এখন থেকে কড়া না হলে সে বড় রকমের ছোঁ মারতে পারে।' বিশ্বমিত্র বলল।

প্রণয়পুষ্পর মুখ কালো ও কঠিন হল, জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাটাকে তাড়িয়ে দেব?'

বিশ্বামিত্র হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে এরকম কর্মচারী আছে বলছেন?'

'হ্যাঁ আছে।'

'তাড়িয়ে দেবেন না। কাজ থেকে সহজে কারোকেই তাড়াবেন না, সেটা আপনারই পরাজয়। নিজের বুদ্ধি খাটান, ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করুন, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

তারপরই বিশ্বামিত্র কোষ্ঠী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অনেক কিছু মনে মনে বিড়বিড় করল, ছকে কিছু লিখল, আঙুলের কড় গুণল। এই নৈঃশব্দ্যের মধ্যে দুবার দুটি সন্দেহজনক শব্দ, পিছনে পর্দার আড়াল থেকে এসেছে। একটি, মৃদু চপেটাঘাত। দ্বিতীয়, ধুপ্‌! বিশ্বামিত্র প্রণয়পুষ্পকে সেদিকে কৌতূহলিত হয়ে তাকাতে দেখেছে। পাঁচ মিনিট পরে সে বলল, 'বলুন, এবার কী জানতে চান? আপনি বোধহয় প্রথমেই জানতে চান, পর্দার পিছনে কিসের শব্দ হচ্ছে?'

প্রণয়পুষ্প বোধহয় মরা মানুষ জেগে উঠতে দেখলেও এত অবাক হত না, সে ফ্যালফ্যাল করে যেন অন্তর্যামীর দিকে তাকিয়ে রইল। বিশ্বামিত্র হেসে বলল, 'আমি একটি ছাগল পুষি, ছাগের দুধ খাই কী

না। গলায় ঘণ্টা নেই, কিন্তু কান ঝাপটালে চাপড়ের শব্দ হয়। বসলে ধুপ্। বুঝলেন ?'

প্রণয়পুষ্প হাঁ করে বলল, 'অ !'

'হ্যাঁ। এবার বলুন তো কী জানতে চান।' বলে পিছনে ফিরে বলল, 'রামেশ্বরী, আছিরে আছি।'

সে বোধহয় কল্পনায় রামকুমারের ভয়ঙ্কর মুখটা দেখতে পেল। প্রণয়পুষ্প জিজ্ঞেস করল, 'ব্যবসায় কি নতুন কোন উন্নতির আশা আছে ?'

বিশ্বামিত্র ছকের দিকে চোখ রেখে বলল, 'আছে, এখনই না। অন্যূন এখনো মাস ছয়েক বাকী, তার আগে কোনরকম ঝুঁকি নিতে যাবেন না, ক্ষতি হতে পারে। আচ্ছা, আমিই আপনাকে কয়েকটা খারাপ কথা আগেই বলে দিই। এখন মাস ছয়েকের জন্য আপনি সর্ববিষয়েই একটু সাবধান থাকবেন। প্রথমত, স্বাস্থ্য। রাত্রি জাগরণ কমান, নেশাটাও কমান, রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, হৃদযন্ত্রকে সবল থাকতে দিচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, এখন যে মহিলার সঙ্গে আপনার নিবিড় বন্ধুত্ব চলেছে, তাঁকে একটু এড়িয়ে চলুন, কারণ মহিলাকে ঘিরে একটা দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে, যা আপনার ক্ষতি করতে পারে। ছেড়ে দেবেন না, একটু এড়িয়ে চলুন। তৃতীয়ত, আপনার শ্বশুরালয়। আপনার শ্বশুরবাড়ি আপনার প্রতি খুব খুশি না। এরা আপনার অন্য কোন ক্ষতি করতে পারুক না পারুক দুর্নাম রটাতে পারে। পারে কেন, রটায়, তাই না ?'

প্রণয়পুষ্প বিস্ময়ের আঘাতে কাশতে কাশতে বলল, 'আজ্ঞে সব ঠিক।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'এই তিনটেই যা একটু বেশি খারাপ দেখছি। বাকী তেমন কিছু না। স্বভাব মধুর রাখুন, মিষ্টবাক্য বলুন, বুদ্ধিকে চালিত করুন, ব্যক্তিত্বকে ঠিক মত প্রয়োগ করুন। সব ঠিক হবে। আপনার নতুন গৃহের সম্ভাবনা আছে তিন বছরের মধ্যে, গৃহটি ছোট

হলেও তার সংলগ্ন সীমা অনেকখানি, জলাশয় অর্থাৎ পুকুর বাগান সহ বাড়ি হবে। সন্তানদের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল, ছোট সন্তান— ছেলেটি একটু ভোগাতে পারে। তবে চূড়ান্ত খারাপ কিছু হবে না। আপনার স্ত্রীর একটি ফাঁড়া আছে, কাটিয়ে উঠবেন। ওঁকে একটি পলার আংটি পরতে বলবেন, পলাটি যেন চামড়ায় স্পর্শ করে। আর আপনি ইচ্ছা করলে দশ রতির একটি পান্না পরতে পারেন, ভাল ছাড়া ক্ষতি হবে না।'

কথাগুলো সে যেন চোখ বুজে একটা ঘোরের মধ্যে বলে গেল। তারপরে প্রণয়পুষ্পর কোষ্ঠী পাকিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে, দামী সিগারেটের প্যাকেটটি হাতে তুলে নিল, কিন্তু খুলল না। প্রণয়পুষ্প কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দক্ষিণা কী দেব?'

'দক্ষিণা?' বিশ্বামিত্র হাসলো হা হা করে, বলল, 'সে যা আপনার মর্জি। আমাকে কেউ দশ দেয়, একশো দেয়, পাঁচশোও দেয়, আবার কেউ হয়তো কিছুই দেয় না। তবে একটা কথা আপনাকে কিন্তু আমি বলি নি।'

প্রণয়পুষ্পর কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা, 'কী বলুন তো?'

'আপনি মশায় বেশ কৃপণ।' বলেই হো হো করে হেসে উঠে আবার বলল, 'ভাল, সেটা ভাল।'

প্রণয়পুষ্প লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে উঠল। লজ্জিত হেসে, পকেট থেকে একটি কড়কড়ে একশো টাকার নোট বের করে জল-চৌকির ওপর রাখল, জিজ্ঞেস করল, 'আপনি খুশি হলেন তো?'

'আরে মশাই, আপনি কিছু না দিলেও খুশি হতাম। এ কাজ-টাকে যে আমি ভালবাসি।' বলেই সে পরাশর আর ভৃগুর চিত্রের দিকে তাকাল।

প্রণয়পুষ্প কোষ্ঠী নিয়ে নমস্কার করে বিদায় নিল। পিছন থেকে অত্যন্ত গম্ভীর মোটা স্বর শোনা গেল, 'স্যার, দরজাটা বন্ধ করুন।'

বিশ্বামিত্র তাড়াতাড়ি একশো টাকার নোটটা পকেটে পুরে,

তক্তপোশ থেকে নেমে দরজাটা বন্ধ করল। রামকুমার, খাটো, ঈষৎ স্থূল, পায়জামা আর শার্ট পরা। মুখে ক্রোধের অভিব্যক্তি, বলল, 'আপনি আমাকে ছাগল বললেন কেন?'

'তবে কি বলব ওখানে রামকুমার আছে, যে আপনার সব খবর আগেই আমাকে যোগাড় করে এনে দিয়েছে?' বিশ্বামিত্র দামী প্যাকেট থেকে অদামী সিগারেট ধরাল।

রামকুমার বলল, 'তা বলে আপনি ছাগল না বলে অন্য কিছু বলতে পারতেন। আমি কী করব? লোকে বলে সেন্‌টাল ক্যালকাটায় স্‌সালা মোসা নেই। এ্যাই এ্যাতোবড় চড়াই পাখির মত একটা মোসা আমাকে কামড়াচ্ছিল।'

'তা চাপড়াবার কী দরকার ছিল? হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলেই হত!' বিশ্বামিত্র বলল, 'আর ধুপ্‌ শব্দটা কিসের?'

রামকুমার আরও উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কি করে আবার, ধুপ্‌ করে স্‌সালা পড়ে গেলাম!'

'কেন?'

'আরস্‌সোলা।

'আরশোলা?'

'হ্যাঁ, আমি এমনিতেই আরস্‌সোলাকে ভয় পাই। কোত্থেকে স্‌সালা একটা আরস্‌সোলা নিঃশব্দে আমার সামনে এসে পড়েছে। ব্যাটাকে তাড়া দিতে গেলাম, তেড়ে এল আমার দিকেই। উঠকো হয়ে বসেছিলাম, ধুপ্‌ করে চেপে গেলাম।'

বিশ্বামিত্র গম্ভীর হয়ে বলল, 'ঘরটা একটু পরিষ্কার রাখলেই পারো তো। এখন যাও, অন্য ক্লায়েন্ট এসে পড়তে পারে। সাবধানে থেকো, শব্দাশব্দি কোরো না।'

রামকুমার বলল, 'কিন্তু স্যার, আপনি ছাগল-টাগল বলবেন না, পেস্‌টিজে খুব লাগে, সত্যি বলছি মাইরি। আচ্ছা, ওই পেনয়েস্‌পু কত ছেড়ে গেল?'

বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পেনয়েস্‌পু ? সেটা আবার কে ?'

'এই যে এখন এসেছিল, পেনয়েস্‌পু তো নাম ?'

বিশ্বামিত্র বলল, 'সারাদিন পান চিবোও, দশ পয়সা দিয়ে একটা প্লাস্টিকের জিভছোলা কিনতে পারো না ? প্রণয়পুষ্পকে বলছ পেনয়েস্‌পু ? লোকটার নাম ওভাবে বলছ, কী করে তুমি ওর নাড়ি নক্ষত্রের খবর যোগাড় করে এনেছিলে ?'

রামকুমার আকর্ণ হেসে বলল, 'অই তো স্যার, স্‌সব নাম স্‌সবাই বলতে পারে না, কিন্তু হাঁড়ির খবর বের করে নিয়ে আসতে পারে। মনে হয় লোকটা ভালই দিয়েছে, না ? গুলগুলো দারুণ ছাড়ছিলেন স্যার।'

'আহ্‌! গুল বলো না রামকুমার, গণেশ উল্টে যাবে।'

রামকুমার জিভ কেটে কান মুললো। বিশ্বামিত্র পকেট থেকে একশো টাকার নোটটি বের করে দেখাল। বিশ্বামিত্র গেয়ে উঠল, 'পরাশর আমার বাবা, ভৃগু আমার ভাই/জগৎ সংসারে আমার কোন ভয় নাই।'....

হঠাৎ দরজায় করাঘাত। বিশ্বামিত্র ইশারা করতেই রামকুমার ছুটে পর্দার আড়ালে চলে যায়। কিন্তুবিশ্বামিত্র গান থামায় নি, সে গেয়েই চলেছে,'জগত সংসারে চল হে/তাঁহারি করুণা জপো রে।'....

দরজায় জোরে করাঘাত। বিশ্বামিত্র গান থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে ? যাই।'

তক্তপোশ থেকে নেমে সে দরজা খুলতে গেল। দরজা খুলে দেখল, একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের মহিলা। দেখতে শুনতে মোটামুটি। কাঁধে একটি ব্যাগ। দেখলে মনে হয়, কোন চাকরি-বাকরি করেন। হাত তুলে নমস্কার করে বলল, 'বিশ্বামিত্র চট্টোপাধ্যায় আছেন ?'

'আমিই। নমস্কার। আসুন।'

বিশ্বামিত্র গম্ভীরভাবে তক্তপোশের ওপর নিজের জায়গায় বসে বলল, 'বসুন।'

মহিলা বসলেন, তাঁর মুখে একটু বিস্ময়ের অভিব্যক্তি। বিশ্বামিত্র নোট-বুক খুলে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাম কি রূপরতিকুমারী দাশ?'

মহিলা বললেন, 'হ্যাঁ, মিস রূপরতি দাশ।'

'আপনার বোধহয় আরো আগে আসার কথা ছিল।'

'হ্যাঁ, পারলাম না। মর্নিং-এ ইস্কুল কী না। ছুটির পরে আসতে আসতে দেরি হয়ে গেল।'

তারপরে যথাপূর্বং চলল বিশ্বামিত্রর জাদুকরী ভাগ্য-গণনা, বিস্ময়ের অতীত কথন, জাতিকার কামনা-বাসনার ব্যাখ্যা, প্রেমযোগ, বিরহযোগ, বিবাহযোগ, ভূত-ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য ফাঁড়া, শুনে মিস রূপরতি দাশ মুগ্ধ বিগলিত, কিন্তু আড়াই টাকার বেশি তার সম্বল নেই, এবং তিনি জেনেই এসেছেন, বিশ্বামিত্র জ্যোতিষীর মত এমন দয়াবান জ্যোতিষী আর নেই। বিশ্বামিত্র শিবনেত্র হয়ে, প্রায় একটি অতীন্দ্রিয় হাসি হেসে, ওপর দিকে হাত তুলে দেখিয়ে দিল, বলল, 'সবই তাঁর দয়া।'

মিস রূপরতি দাশ বিদায় নেবার পরে বিশ্বামিত্র হেঁকে বলল, 'বোম্‌কালী কেলকাত্তাওয়ালী কালী কেলকাত্তামে বৈঠল্ বারম্বার ভারত মে। যা নেই, তাই! যা আছে, তা এই!'

বলে টাকা আড়াই হাতে তুলে নিল। রামকুমার নিঃশব্দে পর্দার পিছন থেকে এসে দাঁড়াল, জিজ্ঞেস করল, 'যা নেই মানে?'

'যা নেই মানে, রূপও নেই, রতি বহুত্ দূর, রূপেয়া যা আছে তা এই।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'এরকম মক্কেল জুটিও না রামকান্ত, চলবে না।'

'রামকান্ত না স্যার।'

'রামকান্তকুমার, হল তো?'

'মোটেই না, কান্ত-টান্তর কোন ব্যাপারই নেই. স্রেফ কুমার।'

'ও, রামকুমার। ঠিক আছে, কিন্তু এই একশো টাকার পরেই আড়াই টাকা—'

রামকুমার বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু মনে রাখবেন স্যার, পেনয়েস্‌পু পালের মত সাঁসাল খদ্দের জীবনে দুবার পেলেন। এখনও আমাদের টাটের লক্ষ্মী পাঁচসিকে আড়াই টাকার খদ্দেররাই।'

বিশ্বামিত্র আবার শিবনেত্র হয়ে হাসল, 'ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ রামচন্দ্র —'

'কুমার।'

'থুড়ি, কুমার। কিন্তু তুমি যদি প্রণয়পুষ্পকে পেনয়েস্‌পু বলতে পারো, তোমাকে কেন রামাধাগা বলা যাবে না? ··আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি রামকুমার, তুমি ঠিক বলেছ, পাঁচসিকে হচ্ছে আমাদের আসল রেট। আসলে কী জানো রামকুমার, এক সময়ে একশো টাকার নোট হাতের ময়লা ছিল কী না, তাই এখনো অল্পস্বল্প হাতে এলে মাথাটা বিগড়ে যায়।'

রামকুমার বলল, 'কী করবেন স্যার, আপনার মেলগ্রপাতি ব্যয়ে।'

বিশ্বামিত্র হেকে উঠল, 'ওই ওই ওই, ওই যা বলেছ রামকা—থুড়ি কুমোর।'

'কুমোর?' রামকুমার প্রায় চমকে উঠল

'আকারের জায়গায় ওকার হয়ে গেছে, নেহাত মুখ ফসকে, রাগ করো কেন।' বিশ্বামিত্র বলল, 'কিন্তু ভাবো, আজ যখন হরে ছুঁচোর নাকের ডগায় বাকি টাকাটা ফেলে দেব, আর মাছের মুড়োটি দাবি করব-ও-ও-ও।' শেষের দিকে, কথায় কীর্তনের সুর লেগে গেল।

রামকুমার চোখ কপালে তুলে বলল, 'বাকী টাকাটা ফেলে দেবেন? হরিয়ানন্দর হোটেলের বাকী টাকা। সর্বনাশ! কখনো

করবেন না স্যার। আপনাকে বলে দিয়েছি না, কিছু শোধ, কিছু বাকী, এইটি যদি না চালিয়ে যেতে পারেন, তাহলে আর অন্ন জুটবে না। যেদিন সব শোধ দিয়ে দেবেন, ওই হরিয়ানন্দ আপনার নাকের ডগায় দরজা বন্ধ করে দেবে।'

বিশ্বামিত্র মাথা ঝাকিয়ে বলল, 'ঠিক ঠিক, ভুলে যাই গোলাম হোসেন, আমি এখন কে, আমি এখন কী। তোমার উপদেশ আমার মনে থাকে না।' একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তার মানে হল, ধার-শোধের আশায় আশায় হরিয়ানন্দ পচা পাতকো যা খাওয়াচ্ছে, সে বরাদ্দটি বন্ধ করতে ভরসা পাবে না, তাই তো?'

রামকুমার আকর্ণ হেসে ঘাড় ঝাঁকাল, বলল, 'স্যার, আপনার বেশ অ্যাকৃটিনি আসে।'

'অ্যাকৃটিনি?' বিশ্বামিত্র ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'সেটা কী?'

রামকুমার বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল, 'অ্যাকৃটিনি অ্যাকৃটিনি, যাত্রা থেটারের পাট বোঝেন না? ওই যে বললেন, ভুলে যাই গোলাম হোসেন!' রামকুমার থিয়েটারি ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল।

বিশ্বামিত্র হঠাৎ গম্ভীর হল, বলল, 'হুম্! আর একজন মক্কেল এখনই এসে পড়তে পারে।'

রামকুমার চমকে উঠে, দৌড়ে পর্দার আড়ালে চলে গেল। সে সময়েই শোনা গেল. 'আসতে পারি?'

বিশ্বামিত্র ডাকল, 'আসুন।'

ঘরে ঢুকল একজন মাঝবয়সী লোক। পোশাক দেখে মনে হয়, নিম্ন-মধ্যবিত্ত। চলল বিশ্বামিত্রর খেলা, পরিণাম একই, মক্কেল মুগ্ধ ও খুশি। পকেট থেকে গুণে গুণে খুচরো নয়া পয়সায় পাঁচসিকে জলচৌকির ওপর রাখল, তারপরে বিশ্বামিত্রর পা খুঁজতে লাগল প্রণামের জন্য।

বিশ্বামিত্র বলল, 'ওতেই হবে, ওতেই হবে। জয় পরাশর, জয় ভৃগু।'

লোকটি বেরিয়ে যাবার পরে বিশ্বামিত্র দরজা বন্ধ করে দিল।

বিশ্বামিত্র তক্তপোশে বসে দামী প্যাকেট থেকে সস্তা সিগারেট বের করে ধরাল। রামকুমারের মুখে এখন স্বস্তি, সে মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে দুলছে, আর হাসছে, আর নিবিড় শ্রদ্ধা ও প্রশংসায় বিশ্বামিত্রকে দেখছে। বলল, 'স্যার, এসব মক্কেলদের হাঁড়ির খবর জেনে এসে আপনাকে সব বলি। কিন্তু মনে হয়, আপনি সত্যি সত্যি জ্যোতিষী জানেন।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'না জানলে কী হবে বল। যার লগ্নপতি ব্যয়ে নজর দিয়ে আছেন, তাকে কম বেশি সবই জানতে হয়।'

রামকুমার মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলল, 'তা যা বলেছেন। সিদিনে সেই সাহেবটার সঙ্গে আপনি যে ভাবে ইঞ্জিরি বললেন, আরেব্বাস্! রাস্তার লোকেরা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার কথা শুনছিল। আমার তো স্সালা বুকের ছাতি ফুলে এই।'

বিশ্বামিত্র অবাক স্বরে বলল, 'তাই নাকি? তাহলে দুনিয়ায় আমাকে ভালবাসার লোক একজন আছে?'

রামকুমার হেঁ হেঁ করে হাসল। বিশ্বামিত্র চকিতের জন্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। রামকুমার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা স্যার, আপনি যে মাঝে মাঝে এলাত বেলাতের কথা বলেন. সত্যি সত্যি বেলাত কখনো গেছলেন, নাকি ওটাও গুল্?'

বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বেলাত?' তারপরেই হেসে বলল, 'ওহ্, মানে বিলেত! তা বলতে পারো, ওটাও একটা গুল্। জগতে ক'রকমের গুল্ আছে বল তো?'

রামকুমার বলল, 'তার কোন শেষ আছে স্যার, যত আপনি দিতে পারবেন।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'তা ঠিকই বলেছ, কিন্তু এটা হল কথার গুল। আর একরকম গুল আছে, তাকে বলে গোলাপ।'

রামকুমার হেসে বলল, 'গুল্ দিচ্ছেন স্যার?'

বিশ্বামিত্র গম্ভীর স্বরে বলল, 'না, গোলাপকে ফারসি ভাষায় গুল্ বলে, জেনে রাখো।' বলে, বিশ্বামিত্র গজলের সুরে গান গেয়ে উঠল,

অয় গুল্ ও! রিন্দীকুন্ খুশ্‌বাস্
বাগ্ তৌরে অজব্ লজিমে ঐয়ম-ই শবাহবস্ত্।

রামকুমার মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'স্যার, আপনার এত গুণ থাকতে এমন জায়গায় পড়ে আছেন কেন বুঝতে পারি না। রেডিওতে এত ভাল গান শোনা যায় না, এমন চাঁছাছোলা দরাজ গলা। আহা। এমন গান গাইতে পারেন, দরকার হলে রঙ-তুলি দিয়ে পরাশর আর ভৃগু মুনি আঁকতে পারেন, আবার ইঞ্জিরিতে কেমন কইয়ে বলিয়ে। যেন একেবারে গুণনিধি।'

'কেমন গুল্ মারতে পারি, সেটা বললে না?' বিশ্বামিত্র জিজ্ঞেস করল।

রামকুমার হাত জোড় করে বলল, 'সে ব্যাপারে তো স্যার পণ্ডিত বেস্পতি।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'আসলে সেই লগ্নপতি ব্যয়ে, কিছুই থাকবার না, সবই জলে ধুয়ে যায়। তা, বলতে পারো, তোমাদের 'বেলাতে'ও সত্যি সত্যি গেছলাম। লগ্নপতির নজরটা তখন জানা ছিল না: মানে বুঝলে, এ গুল্ যে-সে গুল্ না, বুঝতে পারি নি।'....

বিশ্বামিত্র নিশ্বাস ফেলে, সিগারেট টেনে, ধোঁয়া ছাড়ল। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল লণ্ডনের ঘরের সেই বৃষ্টি-ঝরা বিকাল, যখন টেলিগ্রাম গিয়ে পৌঁছুল। প্রেরক ওর বাবার একান্ত-সচিব। বক্তব্য ছিল, 'কলকাতায় ফিরে এস। লণ্ডনের সমস্ত পাট শেষ করো: পারিবারিক পরিবর্তন অভূতপূর্ব। এসে নিজের চোখে সব দেখ এবং জানো। এখন আর এর বেশি কিছু জানাবার নেই।'

সমস্ত ব্যাপারটাই এমন অদ্ভুত মনে হয়েছিল, টেলিগ্রামটা ভৌতিক কী না, সন্দেহ হয়েছিল। বাবার কথা টেলিগ্রামে কিছুই ছিল না। বিশ্বামিত্র গিয়েছিল আইন পড়তে। এক বছর মাত্র কেটেছিল। এক বছরের মধ্যে কী অভূতপূর্ব পরিবর্তন হতে পারে ও কিছু অনুমানই করতে পারে নি। দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে বিশ্বামিত্র বাড়িতে ট্রাঙ্ক-কল করেছিল লণ্ডন থেকে। নো রেসপন্স্ হয়েছিল। বাড়িতে বাবা ছাড়া, নিজের বলতে কিছু পোষ্য আত্মীয়স্বজন ছিল, আর ছিল দাস-দাসী পাচক-ড্রাইভার, বলতে গেলে গমগমে বাড়ি, অথচ টেলিফোনটা নো রেসপন্স্ হচ্ছিল দেখে, ওর মনে হয়েছিল, বাড়িটা যেন মৃত শ্মশানপুরী। ও ভূতগ্রস্তের মত কলকাতায় ফিরে এসেছিল।

ফিরে এসে দেখেছিল, পরিবর্তন না, ধ্বংস। একটি পরিবার, একজন সম্পন্ন, সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, বলতে গেলে একেবারে নিশ্চিহ্ন। অথচ হত্যা না, আগুন লেগে পুড়ে যায় নি, কিন্তু ব্যাপারটা যেন সেই রকমই। একটি সংবাদেই বাবা হার্টস্ট্রোকে মারা গিয়েছিলেন, এবং বাড়িটি কোর্ট থেকে সিজ্ করে, তালা বন্ধ করে দিয়েছিল, এবং গাড়িও নিয়ে নিয়েছিল। ঠিক যেমন করে একটা মৌচাক ভেঙে দেওয়া হয়, কেবল গাছের ডালে একটি কালো দাগ থাকে, তালা-বন্ধ বাড়িটা সেইরকম দেখাচ্ছিল। ভগ্ন চাকের একটি দাগ মাত্র।

বাবার একান্ত-সচিব মিঃ ঘোষের কাছে ঘটনাটা যতখানি শুনেছিল তা হলো, বাবার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রটা শুরু হয়েছিল বিশ্বামিত্রর ইংল্যাণ্ড যাবারও আগে। একটি বিরাট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন ঘুমন্ত শরিক, যাকে বলে স্লিপিং পার্টনার। পার্টনারকে বিশ্বাস করে যে বিশাল অঙ্কের টাকা তিনি ব্যাঙ্ক থেকে ওভারড্র করে ব্যবসাতে লাগিয়েছিলেন, তার অঙ্ক কম করে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। জানতেন না, তিনি বালির বাঁধ তৈরি করছেন, আর তাঁর

পার্টনার নলিনাক্ষ মুখার্জি, তাঁরই টাকায়, নিজের নামে ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। যখন জানা গেল, তখন নলিনাক্ষ সব দিক থেকে প্রস্তুত, নিশ্ছিদ্র আইনের আয়ুধে নিজেকে নিশ্চিন্ত করেছে।

তারপরেও মিঃ ঘোষ বিশ্বামিত্রকে নিয়ে বাবার উকিলের কাছে গিয়েছিলেন। উকিল সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়ে, বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'ব্রাণ্ডার যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, তুমি আজ কপর্দক-শূন্য। নলিনাক্ষর বিরুদ্ধে যদি লিটিগেশনে যেতে চাও তার জন্যও দরকার অনেক টাকার।'

বিশ্বামিত্র করুণ হেসে বলেছিল, 'আপাতত আমার নিজের বলতে আমি, আমার কিছু পোশাক, আর আমার একটি ভায়োলিন, একটি মাউথ অর্গান, আর—' বলে পকেট থেকে পার্স বের করে একশো টাকার কিছু বেশি দেখিয়েছিল। এবং বলেছিল, 'এই আছে। এ টাকায় কলকাতায় ক'দিন চলতে পারে, আজ পর্যন্ত আমার সে ধারণাও হয় নি।'

মিঃ ঘোষ বোধহয় একটু বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন, ভাঙা ভাঙা স্বরে বলেছিলেন, 'তোমার বাবা বেঁচে থাকলে, আগের অবস্থা থাকলে, এ টাকায় তোমার দুদিন চলত, আর এখন—'

মিঃ ঘোষের গলার স্বর ডুবে গিয়েছিল। বিশ্বামিত্র বলেছিল, 'বুঝেছি। এখন আমি একটি পপার। এ টাকা সম্বল করেই আমার যাত্রা।'....

বিশ্বামিত্র তবু একবার নলিনাক্ষ মুখুজ্যের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নলিনাক্ষ দেখা করে নি, দয়োয়ানের জবাবটা ছিল এই রকম, সাহেব বললেন, সাহেব নেই। বিশ্বামিত্র বলেছিল, 'তোমার সাহেব দারুণ এলেমদার। জোয়াব নেই।'

বিশ্বামিত্র তারপর কলকাতার জনারণ্যে কোথায় হারিয়ে গেল, কেউ খুঁজে পেল না। একমাত্র নলিনাক্ষ মুখুজ্যেই বোধহয় এখনো

মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে, বিজয় চাটুজ্যের ছেলে বিশ্বামিত্রটা কোন রকমে তার কবর খোঁড়ার চেষ্টা করছে কী না, কেন না, তার কোন মৃত্যু-সংবাদ সে পায় নি।

বিশ্বামিত্র নিজেও যে তা ভাবে নি, তা না; কিন্তু বুঝতে পেরে-ছিল, সে একান্ত অসহায়, প্রতিশোধ নেবার কোন উপায় নেই। তার সঙ্গে চিরসঙ্গী হয়েছিল নিজের বেঁচে থাকাটা। যে পরিবারে, যে পরিবেশে ও মানুষ হয়েছিল সেখানে এমন তালিম ওর জোটে নি, সংসারে আর দশজন যেভাবে খেটে রোজগার করতে পারে। অন্তত সে ধরনের কাজে, ওর কোন শ্রদ্ধা ছিল না, আকর্ষণও ছিল না, অবিশ্যি, একটি মাত্র পেটের জন্য তেমন কোন গুরু দায়িত্ববোধও ছিল না। জীবনের আকস্মিকতা, পরিণতির নাটকীয়তা ওর মধ্যে সৃষ্টি করেছিল একটা অসংগঠিত মানসিকতা, দশজনের মত স্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রতি বিরূপতা, আর এক ধরনের সিনিসিজম্। অথচ ওর ভিতর ছিল নানান গুণের নানান রস, যা কখনো ভিয়েনের পাকে একটা গোটা রূপ ধরে উঠতে পারে নি।

তারপরে, উত্তর ঘেঁষে, মধ্য-কলকাতার এই আশ্রয়। রামকুমার কেমন করে কখন যেন জুটে গিয়েছিল। কিছুদিন পোর্ট এলাকায় অন্ধ সেজে ভায়োলিন বাজাত। কলকাতারই এক অন্ধ ভিখারি ভায়োলিনিস্টের অনুকরণ করে। দৃষ্টিশক্তি ধরা পড়ে যাবার পরে পালাতে হয়েছিল। ভায়োলিনটা বিক্রি করে দিয়েছিল।

করবার চেষ্টা করেছে অনেককিছু; কিন্তু গোলমালটা যে গোড়াতেই ছিল। কমন ম্যান-এর বাঁচবার তাগিদের সুষ্ঠু দিকটা ওর আয়ত্তে ছিল না। জ্যোতিষীর চিন্তাটাও মাথায় এসেছিল এক অবাঙালী জ্যোতিষীকে ওর পিছনে পিছনে আসতে দেখে, যে জোর করেই প্রায় ওর ভাগ্যগণনা করেছিল। রক্তাম্বরে সজ্জিত, রক্ত-তিলক পরা লোকটি প্রথমেই বলেছিল, 'বেটা, জীবন মে বড়া দুখ

মিলা, আভিতক্ তেরা দিল্ ঠিক নেহি হোনে পায়া। মগর তু তো রাজকুমার থা, ম্যায় দেখনে পাতা।'

বিশ্বামিত্র প্রথমটায় একটু অবাক হয়ে ছিল, তারপরে বুঝেছিল, ওকে দেখে ওসব কথা বলাটা এমন কিছু আশ্চর্যের না। ও নিজেই অনেককে দেখে ওরকম বলে দিতে পারে। যেমন সেই গণৎকারকেই বলে দিতে পারত তার পকেট গড়ের মাঠ, কোন সকালে কপালে আঁকবার সিঁদুরটুকুও বোধহয় ঝোলায় নেই। তারপরই ওর মাথায় এসেছিল, জ্যোতিষী করলে কেমন হয়। তখনই সে রামকুমারকে তালিম দিয়ে, কাজ শুরু করে দিয়েছিল। অবিশ্যি নিজেকেও কয়েকটি বইপত্র নাড়াচাড়া করতে হয়েছিল। তা ছাড়া খবরের কাগজ আর পত্রপত্রিকাগুলোর কল্যাণে আজকাল জ্যোতিষীর বিষয় সবাই বেশি জানে। ভাওতার পক্ষে ওটাই যথেষ্ট, তাছাড়া খদ্দেরের পিছনে রামকুমারের গুপ্তচরবৃত্তিও তো আছেই।

'তা হলে স্যার, বেলা তো হল, যেতে যেতে হয়।'

রামকুমার বিশ্বামিত্রর ধ্যান ভাঙাল। বিশ্বামিত্র চমকে উঠল, বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো। কিন্তু তার আগে, একশো টাকার নোটটা ভাঙাতে হয়, তোমার কমিশনটা দিতে হবে।

রামকুমার বলল, 'ভাঙাতে স্যার আপনাকেই হবে, আমি ভাঙাতে গেলে চোর বলে পুলিসে ধরিয়ে দেবে।'

বিশ্বামিত্র ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'সেটা অবিশ্যি ঠিক বলেছ। চলো তা হলে, ঘর বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু, এর পরে আবার মক্কেল কবে পাওয়া যাচ্ছে?'

রামকুমার বলল, 'দু-তিন দিন আবার ঘুরি, জুটিয়ে নেব। এখন ক'দিন তো খেয়ে বেড়িয়ে কাটানো যাক।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'প্রণয়পুষ্প পালের মত শাঁসালো মাল পেলে মাসে কয়েকটা হলেই হয়ে যায়।'

'সে তো ঠিক, কিন্তু সুসাল। গমলেস্পুরা ছোটখাটোদের কাছে আসতে চায় না।'

বিশ্বামিত্র তক্তপোশ থেকে নামতে নামতে বলল, 'একটা নয়া ভেক কিছু ধরতে হবে।'

বলে ও'ঘরের পিছনের পর্দা সরিয়ে জানালা খুলল। একটা ছোট উঠোন, চারপাশে ঘর, একটি মাত্র জল-কল, সেখানে স্নান বাসন মাজা জল তোলা নিয়ে তাণ্ডব চলেছে। এ ঘরের বাসিন্দা হিসাবে বিশ্বামিত্রকেও রাস্তার গলি দিয়ে ঢুকে ওখানে যেতে হয়। কিন্তু মেয়ে-পুরুষের ওই ভিড়ে এখন আর যেতে ইচ্ছা করল না। অবিশ্যি এ সময়ে কোন দিনই ও যেতে পারে না। রাত্রে কিছুটা ফাঁকা পেয়ে স্নানটা সেরে নেয়। ও রামকুমারকে নিয়ে, দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ল। বাইরে বেরিয়ে, টাকা ভাঙিয়ে, রামকুমারের ভাগ দিয়ে ও গেল হরিয়ানন্দ হোটেলে।

হরিয়ানন্দ আস্তিকালের চেয়ারে বসে, মান্ধাতা আমলের একটি টেবিলের ওপর খাতা-পেনসিল নিয়ে বসেছে। যে-ঘরে খাওয়া হচ্ছে, সেই ঘরেরই এক কোণে তার টেবিল চেয়ার অফিস। পাশা-পাশি দুটো ঘরে খাওয়া চলে, হরিয়ানন্দ একলাই সব হিসাব রাখে। খাতায় এক নম্বর দু নম্বর ঘর লেখা আছে। বণ্টনকারীকে খালি বলতে হয়, 'দুয়ের পাঁচ ভাত দশ পয়সা', বা 'একের তিন ট্যাংরা মাছের ঝোল' ইত্যাদি। অর্থাৎ দু নম্বর ঘরের পাঁচ নম্বর খদ্দের দশ পয়সার ভাত নিয়েছে, এক নম্বর ঘরের তিন নম্বর খদ্দের ট্যাংরা মাছের ঝোল নিয়েছে। হরিয়ানন্দ পেন্সিলের শিস প্রত্যেকবার জিভে ঠেকায়, আর লিখে নেয়। তারপরে হিসাব করে পয়সা।

বিশ্বামিত্র যখন ঢুকল, তখন মোটামুটি ভিড় রয়েছে। বাইরের বারান্দায় অপেক্ষমাণদের জন্য কয়েকটা ধসে পড়া চেয়ার

আছে। বিশ্বামিত্র ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে বলল, 'নমস্কার হরিয়ানন্দ বাবু।'

হরিয়ানন্দ চশমার ফাঁকে একবার বিশ্বামিত্রকে দেখল, মুখ গম্ভীর হল, খাদকদের দিকে তাকাল, কোন জবাব দিল না। ঠাকুর এক-বার বিশ্বামিত্রর দিকে তাকাল, বিশ্বামিত্র তাকে চোখ টিপল, জিজ্ঞেস করল, 'ঠাকুর, মাছের মুড়ো-টুড়ো আছে নাকি? অনেকদিন খাওয়া হয় নি।'

সেই সময়েই হরিয়ানন্দ বলে উঠল, 'একের ছয়কে আজ মুড়ো দাও ঠাকুর।'

এক নম্বর ঘরের ছয় নম্বর খদ্দের একজন ছোটখাটো দর্জি, নাম বীরেন। সে বিশ্বামিত্রর দিকে তাকিয়ে হাসল। বিশ্বামিত্র বলল, 'কী ব্যাপার হে বীরেন, আজ মাছেরমাথা খাচ্ছ যে বড়?'

চার নম্বর জবাব দিল, 'বীরেন আজ বাকী-বকেয়া সব মিটিয়ে দিল কী না. আজ ওর স্পেশাল খাতির।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'ঠিক আছে, আমি না হয় আজ নগদ কিনে খাব।'

হরিয়ানন্দ বলল, 'কিনে খাবেন? এক টুকরো মাছের সঙ্গে মুড়ো, কম করে পাঁচসিকে লাগবে।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'তাও বড়ির মত টুকরো মাছ, চারাপোনার মুড়ো। বেশ চালিয়ে যাচ্ছেন হরিয়ানন্দবাবু।'

হরিয়ানন্দ ভেংচি কেটে বলল, 'বেশ চালিয়ে যাচ্ছেন হরিয়ানন্দবাবু। বাজারের খবর রাখেন?'

'তা হলে আর আপনার এখানে খেতে আসব কেন?' বিশ্বামিত্র বলল।

হরিয়ানন্দ বলল, 'সেই জন্যই বলতে পারছেন। দেখবেন, ওই মাছওয়ালারা এবার রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে মন্ত্রী হয়ে বসবে।

মেছো বাঙালীর রস নিংড়ে ফুলে ঢোল হয়ে যাচ্ছে: পুঁটি মাছ বলে আট দশ টাকা। আপনাকে পাঁচসিকেতে কি আমি পাকা রুইয়ের মাথা খাওয়াব? কাটা এক কে-জি কম করে বারো টাকা, আস্ত দশ!'

বিশ্বামিত্র বলল, 'মাছওয়ালারা যদি মন্ত্রী হয়, তা হলে আপনারও হওয়া উচিত।'

হরিয়ানন্দ সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'এই জন্য।' বলে একের ছয় তার বাটি হাতড়ে হাতড়ে, প্রায় কয়েক সেকেণ্ড বাদে ছোট এক টুকরো মাছ তুলে বলল, 'পেয়েছি। এইরকম খাওয়াতে পারলে আপনিও ভোটে দাঁড়াতে পারবেন।'

হরিয়ানন্দ রেগে উঠে বলল, 'পঞ্চাশ পয়সায় এর থেকে বড় টুকরো আর কোথায় দেয় মশাই? যেখানে দেয়. সেখানে গেলেই পারেন।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'আপনি মিছে রাগ করছেন হরিয়ানন্দবাবু। দেয় হয়তো, কিন্তু তা বলে ধার খেলেও কি দেয়?'

সবাই হেসে উঠল। হরিয়ানন্দ চেঁচিয়ে উঠল, 'কী হল, হিসাব পাচ্ছি না কেন?'

সেই মুহূর্তেই ঠাকুরের চিৎকার শোনা গেল, 'দুয়ের তিন, পঞ্চাশ পয়সার ভাত, পনেরো পয়সার ডাল, কুড়ি পয়সার কাঁটাচচ্চড়ি।'

হরিয়ানন্দ জিভে পেন্সিল ঠেকিয়ে লিখতে লাগল। বিশ্বামিত্র একটি আসনে গিয়ে বসল, 'ভাত, জলের ডাল দিও না, ডালের জল দাও, নিরিমিষ তরকারি আর মাছ—মাছের মুড়ো।'

হরিয়ানন্দর গলা শোনা গেল, 'বিশুবাবু, আপনার কিন্তু একুশ টাকা বাকি পড়ে গেছে।'

বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে বলল, 'এত টাকা বাকি পড়ে গেছে? ছি-ছি, এখনই কিছু দিয়ে দেব। সব দিতে পারব না অবিশ্যি, অন্তত অর্ধেক দেব।'

হরিয়ানন্দ যেন একটু স্বস্তি পেল. বলল, 'দেবেন, খাবেন, তা হলেই সব চালু থাকবে।'

ঠাকুর বিশ্বামিত্রর সামনে খাবার বেড়ে দিল। বিশ্বামিত্র হেসে বলল, 'তবে একটা কাজ করবেন হরিয়ানন্দবাবু, সাবেককালের বাটিগুলো বদলে ফেলুন, বড্ড কানা-উঁচু মনে হয়।'

হরিয়ানন্দ অ্যালুমিনিয়ামের বাটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কানা-উঁচু কোথায় ?'

বিশ্বামিত্র বলল, 'কিন্তু কোথায় যে ডাল-তরকারি পড়ে থাকে, খুঁজেই পাই না, তাই মনে হয়, বাটিগুলোই আসলে কানা-উঁচু।'

আবার সবাই হেসে উঠল। হরিয়ানন্দ আবার রেগে উঠে বলল, 'দেখুন বিশুবাবু, মিছিমিছি ফুট কাটবেন না, বাজারের দরটা দেখেছেন ? দিনকে দিন কী হচ্ছে ?'

'সেই জন্যই বাটির কানা-উঁচু হচ্ছে।' একজন বলল।

বিশ্বামিত্র বলল, 'না, সেজন্য তো হরিয়ানন্দবাবু বাজারের সঙ্গে তাল রেখে দাম বাড়াচ্ছেন।'

আবার সবাই হেসে উঠল।

বিকালের দিকে বিশ্বামিত্রকে দেখা গেল, পার্ক স্ট্রিটের একটা বড় বইয়ের দোকানে। ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে একটা বই পড়ছে। দোকানটায় বই লোনও দেওয়া হয়। অধিকাংশই বাইরের বই। অনেক মহিলা পুরুষ বই দেখছেন, কিনছেন, নিচ্ছেন। বিশ্বামিত্র যে বইটা দেখছিল সেটা রেখে অন্য একটা বই দেখতে লাগল। বইয়ের দোকানের দুজন কর্মচারী ওকে দেখছিল, নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় করছিল। একজন এগিয়ে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কোন বই কিনবেন ?'

বিশ্বামিত্র হেসে বলল, 'না।'

'কিন্তু আপনি অনেকক্ষণ থেকে কোন না কোন বই দেখে যাচ্ছেন।'

বিশ্বামিত্র হেসে জিজ্ঞেস করল, 'আমি তো প্রায়ই দেখে থাকি। আপনি জানেন না?'

লোকটি বিরক্ত হয়ে বলল, 'সেইজন্য প্রায়ই আপনাকে বলা হয়।'

'আসলে কী জানেন,' বিশ্বামিত্র বলল, 'ঈশ্বর আমাকে একটু জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু সেইরকম রেস্তো দেন নি।'

লোকটির ঠোঁটে হাসি ফুটলেও তা গোপন করে বলল, 'আপনার ঈশ্বর যেন আপনাকে জ্ঞান-সঞ্চয়ের জন্য অন্য কোন রাস্তা দেখিয়ে দেন, কিন্তু এটা নিতান্তই বিক্রয়কেন্দ্র, পড়বার লাইব্রেরি না।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'আমি তা জানি, তবু আপনাকে ধন্যবাদ। তবে, হয়তো আগামীকালও এ কথাটা শোনবার জন্য আমাকে আসতে হতে পারে, কেন না সময় কাটাবার মত কাজ আমার বিশেষ নেই।'

বলে ও দোকান থেকে বেরিয়ে এল। সন্ধ্যা নামছে। আকাশটা তেমন সুবিধার না। পার্ক স্ট্রীট জমতে শুরু করেছে। হঠাৎ একটা বড় বিদেশী গাড়ি ওর সামনেই পার্ক করল। গাড়ির ভিতর থেকে যে নেমে এল, ও তাকে চিনতে পারল, নলিনাক্ষ মুখুজ্যের ছেলে। নেমে, পাশেই পেভ্‌মেণ্টের ওপরে একটি ছোটখাটো সিগারেটের দোকানদারকে কী বলল। সে মাথা ঝাঁকিয়ে ভিতর থেকে বের করে দিল এক কার্টন বিদেশী সিগারেট, যার একটা প্যাকেট বিশ্বামিত্র ওর খদ্দেরদের ভাঁওতা দেবার জন্য রেখে দিয়েছে। নলিনাক্ষ মুখুজ্যের ছেলে নবীন টাকা দিয়ে কার্টন নিয়ে গাড়িতে উঠে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিশ্বামিত্র অন্যমনস্কভাবে চলতে আরম্ভ করল, পুরানো দিনের

অনেক টুকরো টুকরো ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠছে। অন্যমনস্ক চলতে চলতে কখন একসময় ও ওদের সেই বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়েছে, বুঝতে পারে নি। এখন বাড়িতে আলো জ্বলছে, লোক-জনের চলাফেরা দেখা যায়। মনে হয়, কোন সুখী পরিবার বাস করছে।

সেই মুহূর্তেই বিদ্যুৎ চমকে উঠল, মেঘের গর্জন শোনা গেল। বিশ্বামিত্র তাড়াতাড়ি ফিরে চলল। সবটাই নবীনকে হঠাৎ দেখতে পাওয়ার ফল। কিন্তু বৃষ্টি এসে পড়েছে, ওকে ওর আস্তানার পথে অনেক দূর যেতে হবে। ও একটা চলন্ত ট্রামে লাফিয়ে উঠল।

বিশ্বামিত্র রাত্রের অন্ধকারে একটি পার্কের পাশ দিয়ে নিজের আস্তানার দিকে চলেছে। রাত্রি দশটায় বিদ্যুৎ বন্ধ হয়েছে। কলকাতার অনেকটা অংশ নির্বাপিত। হরিয়ানন্দর হোটেলে মোম বাতি জ্বালিয়ে খাওয়া সারতে হয়েছে। তারপর আস্তানায় ফেরবার কোন তাড়া ছিল না। এখন রাত্রি প্রায় বারোটা। কয়েক মিনিট আগেই ওর প্রায় সামনেই এক ভদ্রলোককে কয়েক জনের দ্বারা ছিনতাই হতে দেখে, গতিক সুবিধার মনে করল না। আজ ওর পকেটেও কয়েকটা টাকা আছে। সশস্ত্র ছিনতাইকারিদের সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল আছে। যদিও তার এক মিনিট পরেই সেখান দিয়ে ও পুলিসকে যেতে দেখেছে।

নিজের আস্তানায় এসে, চাবি দিয়ে তালা খুলে, দরজা ফাঁক করে ঘরে ঢুকতে গিয়ে ওর মনে হল, কেউ যেন কারোকে কোন নাম ধরে ডেকে উঠল। তারপরেই মনে হল, কেউ ছুটে আসছে। দূরে একটা টর্চলাইট ঝলকে উঠতে দেখা গেল, এবং একটা গাড়ির শব্দও কাছাকাছি শোনা গেল। বিশ্বামিত্র কৌতূহলিত হল, ও রাস্তার ধারে নেমে এল। বুঝতেই পারে নি, রাস্তার ধার ঘেঁষে,

অন্ধকারে একটি মূর্তি দ্রুত এগিয়ে আসছিল, এবং মূর্তিটি বিশ্বামিত্রর ঘরের দরজাটা খোলা দেখে সোজা ঢুকে পড়ল।

বিশ্বামিত্র সেদিকে ফিরতে যাবে, তৎক্ষণাৎ ওর গায়ে টর্চের আলো পড়ল। পড়েই সরে গেল, এবং ওর দরজায় পড়ল, আবার সরে গিয়ে অন্যদিকে পড়ল। টর্চ হাতে লোকটা ছুটতে ছুটতে কাছে এসে আবার বিশ্বামিত্রর গায়ে আলো ফেলল, আর পিছন থেকে একটা প্রাইভেট গাড়ি দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। টচ হাতে লোকটার মুখ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তবে মনে হল ফরসা, এবং তার দ্রুত হাঁপিয়ে পড়া নিশ্বাসে মদের গন্ধ স্পষ্ট। এইরকম ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার, আপনে একটা লেড়কিকে ছুটে যেতে দেখেসেন?'

বিশ্বামিত্র পলকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, মনে হল ওদিকে ছুটে গেল।'

বলে ও দূর পার্কের দিকে আঙুল দেখাল। লোকটা তৎক্ষণাৎ সেদিকে টর্চের আলো ফেলল, আর প্রাইভেট গাড়িটা সেখানে ব্রেক কষে দাঁড়াল। ভিতর থেকে উত্তেজিত প্রশ্ন শোনা গেল, 'হ্যাভ য়ু ফাউণ্ড দ্যাট বিচ্?'

লোকটি বলল, 'নো। দিস ম্যান সেস্, শী হ্যাজ গন্ দ্যাট ওয়ে।'

বলে টর্চের আলোয় দেখাল। গাড়ির ভিতর থেকে হুকুম হল, 'গো, রান অ্যাণ্ড সি। উই হ্যাভ টু ফাইণ্ড হার।'

টর্চ হাতে লোকটি দৌড় দিল, গাড়িটা ধীরে ধীরে এগিয়ে, তার পরে জোরে চলল, এবং দূর থেকে অস্পষ্ট চিৎকার শোনা গেল- 'হোয়াট?' বোধহয় তারই জবাবে, 'নো।'....

বিশ্বামিত্র সহসা ঘরে ঢুকল না। ওর ঘরে ঢুকে যাওয়া মূর্তিটি যে কোনো লেড়কির, তা ও এখনো জানে না। ব্যাপারটা কী হতে পারে, তা ওর মাথায় নেই। তবে, এটা অনুমান করা যাচ্ছে, ব্যাপারটা খুব সুবিধার না। লোকগুলো কোন মেয়েকে

তাড়া করে ধরবার চেষ্টায় আছে, এবং তার জন্য পুলিসের কাছে যেতে বোধহয় রাজী না। বিশ্বামিত্রর নিজের কোন বিপদ ঘনিয়ে আসছে কী না, ও বুঝতে পারছে না, যদি এসে থাকে, তা হলে তার মূল এখন ওরই ঘরে।

বিশ্বামিত্র ভেবে চিন্তা করে, আস্তে আস্তে ঘরের দরজায় ঢুকে, নিচু স্বরে বাংলায় জিজ্ঞেস করল, 'এ ঘরের ভেতরে কেউ আছেন?'

কোন জবাব পাওয়া গেল না। ও তখন ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'ইজ দেয়ার এনিবডি ইন দিস্ রুম?'

প্রায় কয়েক সেকেণ্ড পরে, মেয়ের অস্ফুট স্বর শোনা গেল, 'ইয়েস!'

বিশ্বামিত্র আবার জিজ্ঞেস করল, 'আর য়ু হাইডিং?'

জবাব, 'ওহ্, ইয়েস।'

বিশ্বামিত্র কয়েক সেকেণ্ড পরে আবার জিজ্ঞেস করল, 'শুড আই শাট দ্য ডোর?'

তেমনি অস্ফুট জবাব এলো, 'প্লিজ, ইয়েস।'

বিশ্বামিত্র আবার জিজ্ঞেস করল, 'আয়াম ইন নো ডেঞ্জার? আয় মীন, আয়াম নট গোয়িং টু বী ট্র্যাপড ইন এনি—'

'ওহ্, প্লিজ শাট দ্য ডোর।' উদ্বিগ্ন উত্তেজিত নিচু স্বর বেজে উঠল ওর কথার মাঝখানে।

বিশ্বামিত্র এবার দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করল। পকেট থেকে দেশলাই বের করে কাঠি জ্বালাল, তখনই কারোকে দেখতে পেল না। তক্তপোশের নিচে রাখা হ্যারিকেনটা বের করে আগে সেটা জ্বালাল। তারপরে সেটা তুলে ধরে, বাকী প্রাণীটিকে দেখবার চেষ্টা করল। প্রাণীটি তক্তপোশের পিছন থেকে আস্তে আস্তে মাথা তুলল, তাকাল বিশ্বামিত্রর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে দাঁড়াল। বিশ্বামিত্রর মুখের ওপরেই আলো বেশি,

হ্যারিকেনের স্বল্প আলো মেয়েটির গায়ে পড়েছে। বিশ্বামিত্র মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল, তার উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত চোখে এখন একটি সংশয় আর সন্দেহের ছায়া। দুজনেই দুজনকে খানিকক্ষণ দেখল। তারপরে বিশ্বামিত্র হ্যারিকেন নিয়ে মেয়েটির সামনে এগিয়ে গেল, মেয়েটির পিছনে দেওয়াল, একটু যেন চেপে দাঁড়াল।

বিশ্বামিত্রর মনে হল, মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশের বেশি না। এবং অন্ধকারে ইংরেজি কথা শুনে যতটা কেতাদুরস্ত মনে হয়েছিল চাক্ষুষ তা মনে হচ্ছে না। মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে, তাকে কেবল দীর্ঘ পথ ছুটতেই হয় নি, তাকে অনেক ধস্তাধস্তিও বোধহয় করতে হয়েছে, কারণ তাকে বেশ বিধ্বস্ত আর বিস্রস্ত দেখাচ্ছে। জামার হাতা ছেঁড়া, কপালের সামনে চুল অবিন্যস্ত, যদিও একটি বেণীবন্ধন আছে, তা শিথিল। এক কথায় বলতে হয়, ফরসা মেয়েটি রীতিমত রূপসী, কিন্তু তেমন একটা বুদ্ধি বা বিদ্যার ঝলক নেই। টিকলো নাক, কালো চোখ, স্বাস্থ্যটিও নিখুঁত, এবং লাবণ্যও বর্তমান। জামা শাড়ি কিছুই তেমন মূল্যবান না। কোন অলঙ্কার নেই, খালি পা। বিশ্বামিত্র নিচু হয়ে দেখল, পায়ের একটি আঙুলের নখ ভেঙে রক্ত ঝরছে।

বিশ্বামিত্র মেয়েটির দিকে তাকাল, এখনো মেয়েটির চোখে ভীরু সন্দেহ আর জিজ্ঞাসা। দেখে মনে হয়, বাঙালী না। ও বিদেশী কেতায়, নিজের পরিচয়টা আগে দিয়ে বলল, 'আই অ্যাম বিশ্বামিত্র চ্যাটার্জী।'

মেয়েটি বলে উঠল, 'আপ্—আপনি বাঙালী?'

একটু অন্যরকম শোনালেও, প্রায় পরিষ্কার বাংলা উচ্চারণ। বিশ্বামিত্র এবার একটু অবাক হল, জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি বাঙালী?'

মেয়েটির লাঞ্ছিত ঠোঁটে একটু হাসির আভাস, মাথা নেড়ে বলল,

'নেপালী—নেপালী-বাঙালী মিকসড্। আমার মাতাজী বাঙালী, বাবা নেপালী, আমার নাম সীতা চিত্রকর।'

বিশ্বামিত্র ওর জীবনে ঠিক এরকম নেপালী মুখ দেখে নি, কারণ নেপালী বলতেই চোখের সামনে যেমন আগেই একটি মঙ্গোলিয় ছাপ ফুটে ওঠে, এই সীতা চিত্রকরের চেহারায় তা নেই। এমন কি ওর উচ্চতাও অধিকাংশ নেপালী মেয়ের থেকে বেশি। অবিশ্যি খুঁটিয়ে দেখলে চোখের পাতায় এবং চোয়ালের হাড়ে সামান্য একটু আভাস মিলতে পারে। ও বলল, 'আপনাকে নেপালী বলে বোঝা যায় না। আচ্ছা, আপনি আগে একটা কাজ করুন—কিন্তু আমার সব কথা বুঝতে পারছেন তো?'

সীতা চিত্রকর ঘাড় কাত করে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তা হলে আপনি এই পর্দার পিছনে যান, বালতিতে জল আর মগ আছে। জল দিয়ে পায়ের আঙুল থেকে ময়লা পরিষ্কার করুন। আমার চেলার একটু ডেটল ছিল একটা শিশিতে, দেখি খুঁজে পাই কী না।'

বলে, হ্যারিকেনটা সীতার সামনে রেখে বিশ্বামিত্র ডেটল খুঁজতে গেল, আর মনে মনে এখনো ঠিক যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না, মেয়েটি সত্যি নেপালী। অবিশ্যি একজন নেপালীর সঙ্গে বাঙালীর বিয়ে হওয়াটা কিছুই আশ্চর্যের না। তা হলে কি মেয়েটি ওর মায়ের মত দেখতে হয়েছে? বিশ্বামিত্র তক্তপোশের নিচে হাতড়ে একটি পিজবোর্ডের বাক্স বের করল, তার মধ্যে ডেটলের শিশি পাওয়া গেল। সেটা নিয়ে এসে দেখল, সীতা তখনো দাঁড়িয়ে আছে, মুখ নত। ও জিজ্ঞেস করল, 'কী হল, আপনি এখনো পা ধোন নি?'

সীতা যেন চমকে উঠে শব্দ করল, 'উম্?' তারপরে একটু লজ্জার ভাব করে বলল, 'কিছু হবে না।'

বিশ্বামিত্র ভুরু কুঁচকে উঠল, 'কী বলছেন? ওটা সেপ্‌টিক হয়ে

যেতে পারে, একটু ডেটল লাগিয়ে নিন না। আমি তো আপনাকে একটুকরো ন্যাকড়াও দিতে পারবো না ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার জন্য। যা আছে তাই দিলাম, যান যান, পা ধুয়ে আসুন।'

সীতা চিত্রকর বিশ্বামিত্রর দিকে একবার তাকাল,বিশ্বামিত্র বলল, 'হিয়ার য়ু ক্যান টেক এভরিথিং ইজি। ইট'স মাই পুয়োর হোল, সুড়ং বলতে পারেন। সুড়ং জানেন?'

সীতা বলল, 'গুহা?'

বিশ্বামিত্র বলল, 'তাও বলতে পারেন, তবে গুহা অনেক বড়, এটা নিতান্তই গর্ত। আর আপনি যতক্ষণই থাকুন, আমার জন্য ভয় পাবেন না, ভাববেন না। মেয়েদের নিয়ে আমি জীবনে কখনো মাথা ঘামাই নি, অবিশ্যি যদি আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।'

বলতে বলতে বিশ্বামিত্র সরে গেল, এবং একটি সিগারেট ধরাল। সীতা অপলক অনুসন্ধিৎসু চোখে ওকে কয়েক সেকেণ্ড দেখল, তারপরে হ্যারিকেনটা নিয়ে পর্দার পিছনে চলে গেল।

ঠিক এ সময়েই বিশ্বামিত্র শুনতে পেল, একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে, এবং ওর ঘরের সামনেই দাঁড়াল। লোকের গলার স্বর শোনা গেল। বিশ্বামিত্র পিছন ফিরল, সীতাও পর্দার বাইরে মুখ বাড়াল। বিশ্বামিত্র ফিসফিস করে বলল, 'বাতি নিভিয়ে দিন, ওখানেই থাকুন।'

কথা শেষ হবার আগেই দরজায় ঠুক-ঠুক করে শব্দ হল। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর একটু জোরে, তারপরে আরো জোরে। বিশ্বামিত্র সিগারেট নিভিয়ে, যেন হঠাৎ ঘুম ভাঙার মত শব্দ করে, পেছিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কে? কে দরজা ধাকাচ্ছ?'

বাইরে থেকে অস্পষ্ট শোনা গেল, 'হেলো মিস্টার।'

'কে?'

বাইরে থেকে শোনা গেল, 'প্লিজ, দরবাজাটা একটু খুলেন।'

বিশ্বামিত্র একবার ভাবল, ঘর এখন অন্ধকার, ও মনে মনে তৈরী হয়ে দরজার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে, কাকে চান ?'

আবার সেই স্বর, এক কথা, 'মিস্টার, দরবাজাটা একটু খুলেন, একটা কথা আসে

চিনতে অসুবিধা হয় না, সেই লেড়কি-সন্ধানী লোক। বিশ্বামিত্র ঘুম-ঘুম বিরক্ত চোখ করে দরজাটা খুলল, সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখে এবং ওর ঘরের মধ্যে টর্চের আলো পড়ল। বিশ্বামিত্র বিরক্ত স্বরে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি, কী চান ?'

লোকটার দৃষ্টি ছিল ঘরের মধ্যে। দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বলল, 'মিস্টার, আপনি ঠিক দেখেনিলেন লেড়কি উধার দৌড় গেল ?'

বিশ্বামিত্র আরো বিরক্ত হয়ে বলল, 'ও, আপনি সেই লোক ? পান নি তাকে ? থানা তো কাছেই, পুলিসকে জানান না।'

লোকটা বলল, 'ঠিক আসে, ঠিক আসে। ডোণ্ট মাইণ্ড, লেড়কিটা এ রাস্তায় বেমালুম গায়েব হয়ে গেল।'

গাড়ির ভিতর থেকে ক্রুদ্ধ স্বর শোনা গেল, 'কাম্ অন, ইট'স্ ইউজ্‌লেস্, শী হ্যাজ গন। ডার্টি ক্যালকাটা, অ্যাণ্ড ইট'স্ ইলেকট্রিক সাপ্লাই।'

লোকটা চলে যেতেই, বিশ্বামিত্র দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে গাড়িটা চলে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল। বিশ্বামিত্র দরজায় কান পেতে একটু শুনল, চিন্তিত হয়ে আবার, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল, এগিয়ে গেল পিছন দিকে। কাঠিটা নিভে গেল, আবার একটা কাঠি জ্বালাল। দেখল, সীতার দু'চোখে ভয় আর উত্তেজনা। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা ডাউট করছে, আমি এখানে ছিপা আছি ?'

বিশ্বামিত্র নিচু স্বরে বলল, 'হয়তো করছিল, কিন্তু পরে আর তা করে নি। আমার কথা শুনে বুঝেছে, এখানে আপনি থাকতেই পারেন না।'

সীতা দরজার দিকে একবার দেখল, তারপরে ঠোঁটে একটু হাসি ফুটিয়ে বলল, 'য়োর অ্যাকটিং ইজ গুড।'

বিশ্বামিত্র ভুরু তুলে, নিচু স্বরে বলল, 'বাট মাদ্‌মাজোয়েল, আয়াম নট অ্যান অ্যাক্টর !'

'আপনি কী ?' সীতা জিজ্ঞেস করল, চোখে কৌতূহল।

বিশ্বামিত্র বলল, 'সেটা আপনাকে আমি পরে বলছি, আপনি দয়া করে ততক্ষণ পা ধুয়ে ডেটল লাগান।'

বলে ও সীতার সামনে থেকে সরে গেল। সীতা ওর দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপরে পর্দাটা তুলে, তারের সঙ্গে আটকে দিয়ে, হ্যারিকেনের আলোয় পা ধুতে লাগল। বিশ্বামিত্র নেভানো সিগারেটটা একপাশ থেকে খুঁজে বের করল, এবং সেটাই আবার দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ধরাল। তারপরে তক্তপোশের এক কোণে বসে ব্যাপারটা ভাবতে চেষ্টা করল, কী ঘটতে পারে। মেয়েটিকে এখনো নেপালী ভাবতে অসুবিধা হচ্ছে। বাঙালী-নেপালী মিশ্রণজাত চেহারা কি এ রকম হতে পারে ? লোকগুলো কারা ? এই সীতা চিত্রকরের সঙ্গে সম্পর্কই বা কী ? এবং মেয়েটির এ ঘরে ঢুকে পড়ার পরের পরিণতিই বা কী ?

সীতা হ্যারিকেনটা নিয়ে সামনের দিকে এল। ডেটলের গন্ধেই বোঝা যায়, ও ডেটল লাগিয়েছে, এবং জ্বালাও করছে মুখের অভিব্যক্তিতে তা ফুটে উঠেছে। সীতা ইতিমধ্যেই ঘেমে উঠেছে। খুবই স্বাভাবিক. এ-রকম বদ্ধ ঘর, তার ওপরে ভাদ্র মাসের পচা গুমোট। কিন্তু সীতা তখন দেওয়ালের গায়ে পরাশর আর ভৃগুর ছবি দেখছে। তক্তপোশের একদিকে সরানো নামাবলী ঢাকা জলচৌকি, পাঁজির পাঁজা, কোষ্ঠীর তাড়া, আই-গ্লাস এবং নানাবিধ বই, সবই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

বিশ্বামিত্র তক্তপোশের নিচে থেকে একটি তালপাতার পাখা

বের করে সীতার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এ-ছাড়া আপনার আরামের আর কোন ব্যবস্থা আমার হাতে নেই।'

সীতা পাখাটির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, এবং পাখাটা নিয়ে বলল, 'বহুত সুক্রিয়া, এতেই ম্যানেজ হবে। বিজলী কেন নেই আপনার রুমে ?'

বিশ্বামিত্র বলল, 'কেন লোকে রাস্তায় শোয়, ভিক্ষে করে ?'

সীতা যেন হঠাৎ কথাটা বুঝতে পারে নি, তাই পাখা চালানো থামিয়ে বিশ্বামিত্রর দিকে একবার তাকাল, এবং তারপরেই বলল, 'ওহ্‌ ইয়েস, আয়াম্‌ সরি।'

বিশ্বামিত্র বলল 'ডোণ্ট বী। এখন কথা হচ্ছে, আপনার হাতে কোন ঘড়ি দেখছি না—'

সীতা বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ওহ্‌, আই হ্যাভ! আমার ঘড়ি আছে, আঙুঠি আছে, ইয়াররিঙ্‌ আছে।'

বলে সীতা ওর কোমরের একপাশ থেকে বটুয়ার মত একটা ছোট পুঁটলি বের করল। বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে দেখল, ছোট পুঁটলিটার মধ্য থেকে বেরিয়ে পড়ল ছোট্ট একটি বিদেশী লেডিজ ওয়াচ, সম্ভবত সোনার। ঝকঝকে পাথর বসানো একটি ছোট আংটি, দুটি সোনার বড় রিঙ্‌। বিশ্বামিত্র বলল, 'দেখুন তো রাত্রি কত হয়েছে ?'

সীতা ঘড়ি দেখে বলল, 'একটা চল্লিশ।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'তা হলেই বুঝতে পারছেন, এত রাত্রে আপনাকে আমি খাবার এনে দিতে পারছি না।'

সীতা অবাক হয়ে বলল, 'ইম্‌পসিবল। আমি কিছু খানা খাব না, কোন জরুরত নেই।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'তাহলে আপনি বসুন বা শোন। আপনি খুবই টায়ার্ড।'

সীতা তক্তপোশে বসে বলল, 'ওহ্‌, রিয়্যালি আয়াম টায়ার্ড।'

বিশ্বামিত্র তক্তপোশের একদিকে চাদর জড়ানো বালিশ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি শুয়ে পড়ুন, রাত্রিটা আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আপনার কোন ভয় নেই।'

সীতা তাকাল বিশ্বামিত্রর দিকে, বিশ্বামিত্রও তাকাল। পরস্পর পরস্পরকে কয়েক সেকেণ্ড দেখল। সীতা বলল, 'আফটার অল্, য়ু আর এ ম্যান।'

'ইয়েস, এ ম্যান।' বিশ্বামিত্র বলল, 'এ রিয়্যাল ম্যান, যার কোন একস্‌পিরিয়েন্স আপনার আছে কী না, আমি জানি না।'

বিশ্বামিত্রর শক্ত মুখে হাসি ফুটল। সীতার ঠোঁটেও যেন একটু হাসি দেখা দিল। সে ভালভাবে তক্তপোশে উঠে বসল। বিশ্বামিত্র আবার নিচু হয়ে তক্তপোশের নিচে থেকে টেনে বের করল একটি পাকানো কাঠির মাদুর। সেটা কয়েকবার ঝেড়ে, ফালি মেঝের ওপর পেতে দিল। হ্যারিকেনটা ঝেঁকে বলল, 'তেল যা আছে, সারা রাত্রি জ্বলবে। একটু ধোঁয়া আর গ্যাস হবে। পিছনের জানলাটা খোলা আছে, দম বন্ধ হয়ে মরবার কোন ভয় নেই।'

সীতা হেসে উঠল। বিশ্বামিত্র তার দিকে তাকাল। সীতা জিজ্ঞেস করল. 'আপনি লেয়ট যাচ্ছেন?'

বিশ্বামিত্র বলল, 'আপনি শোবেন না?'

সীতা বলল, 'আমার নিদ আসবে না।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'আমার আসবে।'

'আপনি তো আজীব আদমি দেখছি!' সীতা বলল।

বিশ্বামিত্র বলল, 'থোড়া, কিন্তু আপনার থেকে বেশি না।'

'কেন কেন?' সীতা বিশ্বামিত্রর দিকে ভালভাবে ঘুরে বসল।

বিশ্বামিত্র একটু হেসে বলল, 'ভেবে দেখুন, আপনি এই বয়সের একটি মেয়ে কোথা থেকে কাদের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে আমার এই সুড়ঙে এসে ঢুকেছেন, কিন্তু জানের পরোয়া না করে, ঘড়ি

আংটি ইয়াররিঙ্ পুঁটলিতে গুঁজে নিয়ে এসেছেন, এর থেকে আজীব আর কী হতে পারে?'

সীতা খিলখিল করে হেসে উঠেই তাড়াতাড়ি মুখে হাত-চাপা দিয়ে দরজার দিকে ভীরু চোখে তাকাল। তারপর বিশ্বামিত্রর দিকে তাকিয়ে, নিচুস্বরে বলল, 'আপনি খুব মজাদার বাত বলতে পারেন। কিন্তু আমি কী করব। আমার বটুয়াটা একটা নোকর স্ন্যাচ্ করতে যাচ্ছিল। আমি ভাগবার আগেই বটুয়াতে সব ভরে নিয়েছিলাম, আমার টাকা ঘড়ি আংটি ইয়াররিঙ্। আপনার ঘরে না ঘুসে গেলে ওরা আমাকে পাকড়ে নিত।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'সে কথাই তো বলছিলাম, এরকম তাজ্জব ব্যাপার আমি আর দেখি নি, আর তেমনি আজব মেয়ে আপনি। ওরকম ডাকাতের মত লোকগুলোর কাছ থেকে আপনি পালালেন কেমন করে আর লোকগুলোই বা কারা?

সীতা বিশ্বামিত্রর প্রশ্ন শুনে একটু অন্যমনস্ক হল, বলল, 'সে অনেক বাত, গোস্তাকি আমার। ইট্'স মাই ফল্ট।'

'দো, উওমেন সেলডম্ কনফেস্ ইট।' বিশ্বামিত্র বলল।

তারপরে সীতার মুখ থেকে যে কাহিনী শোনা গেল তার মধ্যে তেমন অভিনবত্ব নেই। দুঃখ প্রেম প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা, এই সব হল পশ্চাদপট। সীতার বাবা, রঘুপতি চিত্রকর একজন নেপালী, প্রকৃতপক্ষে যে রাজপুত বংশোদ্ভূত নেপালী। নেপালের রাজরক্ত তাঁর দেহে নেই কিন্তু রাজাদের দৌহিত্রবংশের রক্ত আছে। তিনি যৌবনে কলকাতায়, ছিলেন, বাঙালী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন, যাঁর গর্ভে সীতার জন্ম। ওর সীতা নাম রাখার কারণ, সীতাও নেপালের মেয়ে ছিলেন, এই-রূপ অনুমান। কিন্তু যত দিন যেতে থাকে, রঘুপতি চিত্রকরের চরিত্রের অন্যান্য দিকগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। তিনি উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের পুরুষ শুধু না, রাজপরিবারের দায়িত্বপূর্ণ পদের চাকরিতে থেকে, নানারকম গোলমাল করেন। সীতার দশ বছর বয়সের সময়

ওর মা মারা যায়। বাবার উচ্ছৃঙ্খলতা তখন থেকে আরো বাড়ে। সীতার জীবনটা নষ্ট হতে বসে। তবু যা হোক ওর লেখাপড়া চল-ছিল। পরে বাবার চাকরি যাওয়ায়, টাকা-পয়সার অভাব দেখা দেয়। সীতার আঠারো বছর বয়সের সময়, ও বাবার সঙ্গে একবার কলকাতা এসেছিল। এই সময় মামার বাড়িতেও যায়। এবং বাঙালীদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ মেলে। কিন্তু একটা বিষয় সীতা বুঝেছিল, মামার বাড়িতে, ওকে ভালভাবে নেওয়া হয় নি। তার কারণও ওর বাবা। মায়ের অকালমৃত্যুর জন্য মামার বাড়িতে সবাই বাবাকেই দায়ী করত।

মামার বাড়িতে একবার পরিচয় হবার পরে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ধরে, কেউ কেউ নেপালে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করত। তারা কেউ ওর মামাতো ভাই, কেউ মামা, কেউ মাসতুতো ভাই। ওর এক কাকার ছেলে, ওর থেকে কিছু বড়, যে দরজা ধাক্কা দিয়ে বিশ্বামিত্রর সঙ্গে কথা বলে গেল, ওর নাম পশুপতি, প্রায়ই বাড়িতে আসত। ইতিমধ্যে বাবা আর একটি বিয়ে করেছিল। সীতার কলকাতার আত্মীয় ভাইদের সঙ্গে পশুপতির খুব ভাব হয়েছিল, এবং বাড়িতে এদের সকলের সঙ্গে বসে বাবা মদ্যপান করত, হৈ-হল্লা চলত।

একবার ওর মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতা থেকে একটি পাঞ্জাবী ছেলে নেপালে গেল, নাম সুন্দরলাল। এবং সে সত্যি দেখতে সুন্দর। সীতা সুন্দরলালের প্রেমে পড়ে। বাবা কখনোই সুন্দরলালের সঙ্গে বিয়ে দেবে না, অতএব কলকাতায় পালিয়ে আসা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কিন্তু ও জানত না যে, প্রেমের খেলাটা আসলে একটা ফাঁদ, মেয়ে বিক্রি অথবা তাদের দিয়ে ব্যবসা করানোটাই সুন্দরলালের আসল ব্যবসা। সুন্দরলাল পশুপতিকে হাত করতে পেরেছিল। সীতা সঠিক জানে না, কোথায় ওকে তোলা হয়েছিল। পরশু রাত্রি থেকেই, ও সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারে, এবং পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কড়া পাহারা ছিল।

শেষ পর্যন্ত আজ চেঁচামেচি শুরু করলে, সুন্দরলাল এবং পশুপতি ওকে থামাবার চেষ্টা করে, বোঝাবার চেষ্টা করে। এতে বোঝা যায়, ওরা সীতাকে যেখানে তুলেছিল, সেখানে জানাজানি হলে গোলমালের আশঙ্কা ছিল। তখন, এমন কি সুন্দরলাল সীতাকে মারধোরও করে, মেরে ফেলার ভয় দেখায়। মৃত্যুভয়েই সীতা তুষ্ণীম্ভাব গ্রহণ করেছিল, এবং ছলনার আশ্রয় নিয়ে, নোকরকে আংটি দেবার লোভ দেখিয়ে, দরজা খুলিয়ে পালায়। যে লোকটা গাড়ির ভিতর থেকে কথা বলছিল, সে সুন্দরলাল।

সীতা থামল। বিশ্বামিত্র বলল, 'আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজে ?'

সীতা ঘড়ি দেখে বলল, 'তিন বেজে পাঁচ মিনিট।'

'তার মানে, রাত্রিটা জেগেই কাটল।' বিশ্বামিত্র বলল, 'আপনার কি মনে হয়, ওরা আপনাকে আরো খুঁজবে ?'

'খুঁজতে পারে, হাওড়া স্টেশন বা দুস্‌রা কোন জায়গায়।'

'আপনি নিশ্চয়ই নেপালে ফিরে যেতে চান ?'

সীতা একটু ভেবে বলল, 'আমি সুন্দরলালের সাথ্ চলে এসেছিলাম। কেন কি, আমার বাবা আমাকে দিয়ে কিছু করাতে চাইছিল, মানে, টু এনটারটেন হিজ ফ্রেণ্ডস্—যার মানে টাকা। আমি নেপাল যাই কলকাতায় থাকি, আমার কাছে সব সমান।'

বিশ্বামিত্র জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে এখন কী করবেন ভাবছেন ?'

সীতা অন্যমনস্কভাবে বলল, 'আই ডোণ্ট নো।'

'বাট য়ু মাস্ট নো।' বলে বিশ্বামিত্র মাদুরে শুয়ে পড়ে বলল, 'শুয়ে শুয়ে ভাবুন।'

সীতা অবাক চোখে বিশ্বামিত্রর দিকে তাকিয়ে রইল। বিশ্বামিত্র চোখ বুজে শুয়ে আছে।

৮

তৎপর ক'দিন ধরে দেখা গেল, বিশ্বামিত্রর সঙ্গে একটি সুকুমার

কিশোর ঘুরে বেড়াচ্ছে, সম্ভবত যে পাঞ্জাবী বা কোন ভিন্ প্রদেশের ছেলে। পায়জামার ওপরে, আলখাল্লা মত লম্বা ঢলঢলে জামা, আর মাথায় পাগড়ি। কপালে শ্বেতচন্দনের একটা ফোঁটা। মাঝে মাঝে তার চোখে থাকে কালো চশমা।

মুশকিলে পড়েছে রামকুমার, তার মনে হচ্ছে, কোথা থেকে একটা ঝামেলা এসে জুটেছে। ছেলেটার গলার স্বর মিষ্টি, এখনো বয়সা ধরে নি, চোখ দুটি সুন্দর, কথা বলে হিন্দীতে। নাম সীতানাথ।

সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটে যায় ঘটনার দিন ভোরবেলা। প্রথমত বাড়ির পিছনে, ভিড়ের মধ্যে, জলকলে বা পায়খানা ইত্যাদিতে, সতীকে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা। একটি যুবতী মেয়েকে নিয়ে ঘোরাফেরা করা কঠিন। ঘরে যারা আসবে তাদের কৌতূহলকে জাগতে দিলে চলবে না। সীতার স্নানটা অবিশ্যি ভোরবেলা ঘরের মধ্যেই সারতে হয়, এবং সকালের মধ্যেই শুকিয়ে নিতে হয়।

ঘটনার দিন রাত্রি তিনটের সময়, বিশ্বামিত্র মাদুরে শুয়ে পড়লেও ঘুমোতে পারে নি, বরং যতই ভোর হয়ে আসছিল, ততই দুশ্চিন্তা বাড়ছিল। সীতা শুতে পারে নি, হ্যারিকেনের আলোতে, তক্তপোশের ওপর চুপচাপ বসেছিল। বিশ্বামিত্র পরিষ্কার বলেছিল, 'আপনার যদি মনে হয় আপনি এখন কয়েকদিন এখানে আত্মগোপন করে থাকবেন, তাহলে আপনাকে খুবই কষ্ট করে থাকতে হবে, আর ছদ্মবেশ নিতে হবে।'

কথাটা শুনে সীতার চোখ-মুখে এমন একটি অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল, যেন এই মাত্র ওকে ফাঁসীকাঠ থেকে নামিয়ে, মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি দেওয়া হল। বিশ্বামিত্র আরো বলেছিল, 'সংসারে অনেক ঘটনা ঘটে, যা অবিশ্বাস্য এবং অলৌকিক, আপনার ঘটনাও তা-ই। সম্ভবত আপনার ভাগ্য আপনি বিশ্বামিত্র চাটুজ্যের কাছে এসে পড়েছিলেন।'

বলে বিশ্বামিত্র বিশেষ একটি দাম্ভিক ভাব করেছিল। সীতা বিশ্বামিত্রকে এক রকম বুঝে নিয়েছিল ওর নারীসত্তা দিয়ে, এ লোক আর দশটা পুরুষের মত চোখে ওকে দেখে নি। ও প্রায় হাতজোড় করে বলেছিল, 'আপনার বহুত কৃপা।'

বিশ্বামিত্র বলেছিল, 'সে কৃপা আপনি হজম করতে পারলেই ভাল।'

সীতা বলেছিল, 'আপনার কী হুকুম, ফরমাইয়ে, আর আভি সে আপনি আমাকে তুম্ বলুন।'

বিশ্বামিত্র বলেছিল, 'তা বলব, তবে কিছুদিন তুমি এখন হিন্দীই বলবে, আর তোমার নাম হবে সীতানাথ।'

'সীতানাথ?' সীতা অবাক হয়ে নিজের শরীরের দিকে তাকিয়েছিল।

বিশ্বামিত্র বলেছিল, 'সীতাকে কী করে সীতানাথ করতে হয়, সেটা আমি জানি।'

তারপরেই ও ওর একটা পুরনো ট্রাঙ্ক তক্তপোশের নিচে থেকে টেনে বের করেছিল। তক্তপোশের নিচেটা একটা জাদুঘর। সীতাকে ও নিজের হাতে সীতানাথ বানিয়ে দিয়েছিল, তখনকার মত আয়নাটা অবিশ্যি বিশ্বামিত্রই ছিল, সীতা নিজেকে দেখতে পায় নি। তবে সীতানাথ বানাবার সময় সীতা একটু লজ্জা পেয়েছিল, আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বিশ্বামিত্র যেন একটা কাঠের পুতুলকে সাজিয়েছিল, মোটেই একটি রূপসী তরুণীকে না।

সাজানো শেষ হতে না হতেই দরজার কড়া বেজে উঠেছিল, আওয়াজ এসেছিল, 'জয়গুরু স্যার, ঘুম ভাঙল?'

বিশ্বামিত্র ঘরের একটা কোণ দেখিয়ে সীতাকে বলেছিল, 'তুমি ওই কোণে বসো, যাতে রাস্তা থেকে তোমাকে দেখা না যায়। ভয় পেও না, যে এসেছে, তার নাম রামকুমার। দরকার মত আমার কাজকর্ম করে দেয়।'

রামকুমার আবার বাইরে থেকে ডেকেছিল। বিশ্বামিত্র দরজা খুলে দিয়ে বলেছিল, 'এসো, রামচন্দ্র—।'

'কুমার স্যার।'

'হ্যাঁ, রামকুমার এসো।' বিশ্বামিত্র তক্তপোশে গিয়ে বসেছিল।

রামকুমার ঘরে ঢুকে, পিছন দিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল সীতাকে দেখে। অবাক হয়ে বিশ্বামিত্রর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এ ছেলেটা আবার কে স্যার, কোথা থেকে এল?'

বিশ্বামিত্র সিগারেট ধরিয়ে বলেছিল, 'আজব এই কলকাতা শহর, এখানে কী না হয়। ছোঁড়া কাল থেকে আমার সঙ্গে ভিড়েছে, ছাড়তে চাইছে না।'

'তার মানে?' রামকুমার বিরক্ত চোখে সীতার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'লালটু মারকা চেহারা দেখিয়ে আপনার ঘাড়ে চেপে গেল স্যার?'

'তাই তো দেখছি।'

'তা হলে ভাগাবার ব্যবস্থা করতে হয়।'

'কী করে?'

'প্যাঁদানি। ওর থেকে বড় ওষুধ নেই স্যার। ওকে উত্তম দিতে হবে, মধ্যম করে, তা হলেই দেখবেন সুড় সুড় করে নেমে যাচ্ছে।'

বিশ্বামিত্র বলেছিল, 'তুমি লোকটা রাম চ—থুড়ি, রাম না—থুড়ি—কুমার, তুমি তো বড় নিষ্ঠুর হে। এরকম কচি ঢলঢলে ছেলেটাকে তুমি উত্তম-মধ্যম দিয়ে ভাগাতে চাও?'

রামকুমার একটু অবাক হয়ে বলেছিল, 'তা ছাড়া উপায়?'

'ভাগাবার দরকার কী?' বিশ্বামিত্র বলেছিল, 'ভাল করে তাকিয়ে দ্যাখো, ছেলেটার মধ্যে একটা ভাগবদ্ ভাব আছে। ঈশ্বরের কৃপা না থাকলে এরকম হয় না। ওকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে।'

সীতা কথাবার্তা শুনছিল, অবাক হচ্ছিল, এবং হাসিও পাচ্ছিল, বিশেষ করে রামকুমারকে দেখে। রামকুমার সীতাকে খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করে আকর্ণ হেসে বলেছিল, 'ঠিক স্যার, কথাটা মিছে বলেন নি, ছোঁড়ার মুখে একটা নিমাই ঠাকুরের ভাব আছে।'

বিশ্বামিত্র ঘাড় দুলিয়ে বলেছিল, 'তা হলেই বোঝ, বিশ্বামিত্র চাটুজ্যে এমনি এমনি কারোকে ঘরে তোলে না। শুনে রাখো, এর নাম সীতানাথ, আসলে বালক-বাবাজী। তুমি ঘর পরিষ্কার করবার আগে মোড়ের মাথা থেকে আমাদের তিনজনের মত পুরী তরকারি জিলিপি আর চা নিয়ে এসো। তার আগে ওর সঙ্গে দু'একটা কথা বলে যাও।'

রামকুমার সীতার সামনে গিয়ে হেসে বলেছিল, 'কী সীতানাথ, তোর বাড়ি কোথায়?'

সীতার মুখমণ্ডল রক্তাভ, হাসি চাপতে গিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল, এবং বিশ্বামিত্রর দিকে তাকিয়েছিল।

বিশ্বামিত্র বলেছিল, 'ওর বাড়ি দ্বারভাঙা, ও আসলে মৈথিলি ব্রাহ্মণদের ছেলে।'

রামকুমার বলেছিল, 'বামুনের ছেলে, ও স্যার দেখেই বোঝা যায়। তা বুঝলে সীতানাথ, তোমার যা নাম, আমারও তাই, রামকুমার।'

বিশ্বামিত্র বলেছিল, 'মোটেই না, রামকুমার মানে রামের ছেলে, লব আর কুশ। আর সীতানাথ হল, সীতার যে নাথ, মানে স্বামী।'

'অত সব বুঝি না স্যার।' রামকুমার সীতার দিকে ফিরে বলেছিল, 'আমি রামকুমার, আমাকে রামদা বলে ডাকবে, বুঝলে?'

সীতা মাথা ঝেঁকে বলেছিল, 'হাঁ।'

রামকুমার ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'ছোঁড়ার গলায় এখনো বয়সা ধরে নি স্যার, মেয়েদের মতন সরু।'

'তা হবে, যাও, তুমি খাবারটা আগে নিয়ে এসো।' বিশ্বামিত্র রামকুমারকে পয়সা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এই ভাবে ঘটনার শুরু, এবং এইভাবেই চলছে। বিশ্বামিত্রর সঙ্গে সীতানাথ নামে একটি মৈথিলি ব্রাহ্মণের ছেলে থাকে, ঘুরে বেড়ায়। হরিয়ানন্দর হোটেলে খেতে যায়। জ্যোতিষীও চলছে, এবং তার সঙ্গে এখন সীতানাথও জুটেছে। বিশ্বামিত্র ওকে তালিম দিয়েছে, যদিও সবটাই ধাপ্পা। সীতানাথ কোষ্ঠী বিচারের সময়. স্থিরনেত্রে কোষ্ঠীর দিকে তাকিয়ে থাকে, এবং হঠাৎ পেন্সিল দিয়ে এক জায়গায় একটি দাগ কেটে দিয়ে, আবার চুপ করে বসে থাকে। আর বিশ্বামিত্র হেঁকে বলে ওঠে, 'চমৎকার, চমৎকার বালক-বাবাজী। শুক্রের এই অবস্থানের সঙ্গে মঙ্গলের বক্রীভাবটা একটা সংকট সৃষ্টি করছে। এখানেই তোমার দৃষ্টির তারিফ করতে হয়'....ইত্যাদি।

একমাত্র রামকুমারই বুঝতে পারছে, সীতানাথ ছোঁড়াকে স্যার ভালভাবেই জ্যোতিষী ভাঁওতা শিখিয়েছে, কিন্তু ছোঁড়ার মুখের দিকে তাকালে মনটা কেমন টলটলিয়ে ওঠে। কেন কে জানে।

মাঝে মাঝে দু'চারটে অন্য ধরনের ঘটনাও ঘটে যাচ্ছে। যেমন একদিন রাত্রি দশটার পরে, সীতা অনুমতি পেয়ে, পাগড়ি খুলে, মাথার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে একটা গান গুনগুন করছিল। বিশ্বামিত্র একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। হঠাৎ বিশ্বামিত্র সীতার দিকে ফিরে বলেছিল, 'তালে তো ভুল করেছই, সুরেও ভুল করছ। কী সুরের গান করছ জানো?'

সীতা অবাক হয়ে বলেছিল, 'না তো!

'বাগেশ্রী, তাল হবে কাহারবা।' বলে সে নিজেই সুর ভেঁজেছিল, আঙুলে তাল দিয়ে দিয়ে।

সীতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি গান জানেন?'

বিশ্বামিত্র বলেছিল, 'আমার বাবার এক সময়ে শখ ছিল, একমাত্র ছেলেকে দেশ-বিদেশের সঙ্গীত আর নৃত্যশাস্ত্র থেকে, একেবারে বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিত করে তুলবেন। কিন্তু হল না কিছুই।'

'কেন ?' সীতা বিশ্বামিত্রর কাছে এগিয়ে এসেছিল।

বিশ্বামিত্র বলেছিল, 'সে অনেক ব্যাপার। যাও, শুয়ে পড়ো গে, রাত হয়েছে, সেই সঙ্গে নিজের ভাবনাটা একটু ভাবো। শুধু জেনে রাখো, আমার লগ্নপতি দ্বাদশে ব্যয়স্থ।' বলে বইয়ের দিকে মনোযোগ দিয়েছিল।

সীতা কেমন বিষণ্ণ অবাক চোখে বিশ্বামিত্রর দিকে তাকিয়েছিল, এবং শুয়ে শুয়ে বিশ্বামিত্রকেই দেখেছিল, আর হুস করে একটি নিশ্বাস ফেলেছিল।

আর একদিন, এরকম রাত্রেই, সীতা বলেছিল, 'আমি আর এভাবে লেড়কা বনে থাকতে পারছি না।'

বিশ্বামিত্র বলেছিল, 'তা হলে কেটে পড়ো। কেটে তো তোমাকে পড়তেই হবে, প্রায় মাসখানেক তো কাটিয়ে দিলে এ ভাবে।'

সীতা বলেছিল, 'কোথায় যাব আমি ?'

বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে বলেছিল, 'তা আমি কী জানি ? যেখানে তোমার খুশি ?'

সীতার চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল। বিশ্বামিত্র বলেছিল, 'এই ছাখো, কাঁদবে না বলে দিচ্ছি। বলে, ওই ভয়ে জীবনে কোনদিন মেয়েদের ধারে-কাছে ঘেঁষলাম না, উনি এসে এখন আমাকে জ্বালাবেন। যাও, শুয়ে পড়ো গে।' কাল সকালে উঠে চলে যেও, কিন্তু মেয়ে হওয়া চলবে না, ছেলে সেজেই যেতে হবে।'

সীতা কোন কথা বলে নি, চুপ করে বসেছিল। তারপরে বলেছিল, 'আপনাকে মালুম হয়, আপনি বিশ্বামিত্র না, বিশ্বামিত্র মুনি আছেন।'

'তবে আর কী, তুমি এখন অপ্সরী হয়ে, আমার ধ্যান ভাঙাবার চেষ্টা কর।' বিশ্বামিত্র বলেছিল, কিন্তু সীতার কষ্টটা বুঝেছিল। এতদিন একটা মেয়ের পক্ষে ছেলে সেজে থাকা কঠিন। একটা ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু কী ব্যবস্থা? ব্যবস্থা কিছু করতে হলে বর্তমান তল্লাট ত্যাগ করতে হয়, কেননা সবাই এখন সীতানাথকে চেনে। রাতারাতি তাকে তরুণী বানিয়ে ফেলা যায় না।

কিছুক্ষণ পরে সীতা বলেছিল, 'আমার মাফিক অপ্সরা আপনার ধ্যান টুটাতে পারবে না।'

বিশ্বামিত্র হেসে বলেছিল. 'না না, তুমি সত্যি সুন্দরী। আমি যদি মুনি হতাম, তা হলে ঠিক ধ্যান ভাঙাতে পারতে। যার ধ্যান নেই, তার তুমি কী ভাঙাবে?'

সীতা জিজ্ঞেস করেছিল, 'সচ্ আপনি আমাকে ভাগিয়ে দেবেন?'

বিশ্বামিত্র বলেছিল, 'বুঝতে পারছি না, তোমাকে নিয়ে কী করি।'

সীতা বলেছিল, 'রামকুমার বলছিল, আপনি বহুত এডুকেটেড, বিলাত ঘুরেছেন।'

'হুম্, বুঝেছি। তবে কেন একটা চাকরি করছি না, তারপরে তোমাকে বিয়ে করে সুন্দর একটি সংসার পাতছি না, কেমন? বিশ্বামিত্র তীব্র হেসে জিজ্ঞেস করেছিল।

সীতার মুখে রক্তিম ঝলক লেগে গিয়েছিল, বলেছিল, 'আই ডিড্‌ নট্ সে দ্যাট!'

'য়ু ডিড নট, বাট আই ডিড!' বলে বিশ্বামিত্র হেসেছিল, 'বলেছি না, মনে রেখো, আমার লগ্নপতি দ্বাদশে ব্যয়স্থ, চলে যাবে, থাকবে না কিছুই।'

সীতা বিমর্ষ অন্যমনস্কভাবে বিশ্বামিত্রর দিকে তাকিয়েছিল।

হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল। সকালবেলা কোন মক্কেলের আসার কথা ছিল না। সীতাকে নিয়ে বিশ্বামিত্র ঘুরতে ঘুরতে উপস্থিত কুমোরটুলি। উদ্দেশ্য, একটু প্রতিমা গড়া দেখা যাক। ভিতরে নানান সংঘের ছেলেদের নানান বায়না, প্রতিমার মুখ কেমন হবে। কেউ কেউ ফিল্মস্টারদের মুখের কথা বলছে।

সীতা কোনদিন এরকমভাবে প্রতিমা গড়া দেখে নি, ওর ভালই লাগছিল। বিশ্বামিত্র একজন শিল্পীর কাজ দেখছিল, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে কেমন করে কাঠ-খড়ের ওপর একটি অপূর্ব দেহ ফুটিয়ে তুলছিল, যার ভঙ্গিমা অপরূপ। সীতা মনোযোগ দিয়ে প্রতিমা গড়া দেখছে, বিশ্বামিত্র দেখল ওকে, এবং হঠাৎই ওর মনে হল, এই তো আমার সামনে কাঠ খড় মাটি জল সবই পড়ে রয়েছে, আমিও কেন একটা প্রতিমা গড়ি না? ঠিক মত তৈরি করতে পারলে, এ তো শিল্পের দেবী হতে পারে। চিন্তাটা মাথায় আসতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। অতঃপর ভাবনা, কী করে তা কার্যকরী করা যায়। কার্যকরী করতে হলে, বর্তমান বাসস্থানে সম্ভব না। কারণ, দেবীকে অবিশ্যিই নারী হতে হবে। গড়বার সময়েই তা অনেকের চোখে পড়বে। অতএব নতুন জায়গা চাই। রামকুমারকে সঙ্গে রাখা যায়, সীতার আসল পরিচয় পেলেও তাকে সামলানো যাবে।

রাত্রেই সে সীতার কাছে ঘোষণা করল, বিশ্বামিত্র সীতাকে গান আর নাচ শেখাতে চায়। ওর যা কিছু জানা আছে, দেশীয় আর বিদেশী সব সে সীতাকে শেখাবে, এবং সীতাকে তা নিষ্ঠার সঙ্গে শিখতে হবে। সীতার অরাজী হবার কিছু ছিল না, কেন না, ওর বিশ্ব এখন বিশ্বামিত্রময়! পরের দিন সকালবেলাই রামকুমারকে বলল, উত্তরের শহরতলি ঘেঁষে একটা ঘর দেখতে, এখানে আর থাকা চলবে না, এবং সে সীতার লিঙ্গ বিভ্রাটের ব্যাপারটাও তার কাছে কবুল করল। রামকুমার হার্টফেল করত, করে নি, তবে প্রায় মৃতকল্প অবস্থায়

সীতার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল। সীতা মুখে হাত-চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েছিল।

বিশ্বামিত্র অনেক করে বুঝিয়েছিল রামকুমারকে, যে ভাবেই হোক, দিন চলে যাবে। রামকুমারের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, কারণ, তার এক কথা, 'ওরে বাবা মেয়েমানুষ! খাল কেটে কুমীর? ভরাডুবির যেটুকু বাকী ছিল, এবার তা ষোলকলা পূর্ণ হবে।'

বিশ্বামিত্রর বক্তব্য, 'আমাদের আবার ভরাডুবি কিসের? আমাদের আছে কী? যেখানেই যাব, জ্যোতিষীর সাইনবোর্ড থাকবে। তবে হ্যাঁ, এখন থেকে লোক-দেখানো স্বামী-স্ত্রীর সংসার করতে হবে? স্বামী-স্ত্রী না সেজে থাকলে, এ দেশের লোককে কিছু বোঝানো যায় না।'

রামকুমার কয়েক দিনের মধ্যেই সিঁথির কাছাকাছি একটা বাসা যোগাড় করল। বিশ্বামিত্র এদিকে সামান্য যা পুঁজিপাটা ছিল তা দিয়ে একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড হারমোনিয়াম, আর ডুগি-তবলা কিনে ফেলল। শুরু হল রেওয়াজ।

একদিকে জ্যোতিষী, অন্যদিকে নাচ-গানের রেওয়াজ, দুই-ই চলল, কিন্তু জ্যোতিষীর কাজে ঢিলে পড়তে আরম্ভ করল, কারণ খদ্দেরের অভাব। রামকুমার নতুন জায়গায় সুবিধা করতে পারছে না। কলকাতা থেকে শহরতলিতে খদ্দেরদের পয়সাও কম।

অবস্থা দেখে, বিশ্বামিত্র একটা ডাক্তারখানাও খুলে দিল, হোমিওপ্যাথি চেম্বার। অথেনটিক বই পড়ে, যতটা পারা যায় চিকিৎসা শুরু করল। ছোটখাটো অসুখে কিছু ফলও হল। বড় কোন অসুখ নিয়ে কেউ এলেই বিশ্বামিত্র ফিরিয়ে দেয়, নিজেই বলে দেয়, 'আমার চেয়ে বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও, এ আমার দ্বারা হবে না।'

ছ'মাসের মাথায় রামকুমার বিদ্রোহ করে বসল, সে আর আধপেটা খেয়ে. এই ধা তিন তিন না, আর সারেগামাপাধানিসা

নিয়ে থাকতে পারবে না। বিশ্বামিত্র বোঝে, রামকুমারের বিদ্রোহটা অনর্থক না। সে আর সীতা যে মনের জোর আর ইচ্ছে নিয়ে নেমেছে, ওর সেটা নেই, থাকবার কথাও না। অতএব বিশ্বামিত্র একটা প্ল্যান ঠিক করে ফেলল। তার জন্য দুদিন সময় নিয়ে ওকে একটু তৈরি হতে হল।

তৃতীয় দিন, ভোরবেলা, মিশ্রিত যাযাবর পোশাক পরে, বিশ্বামিত্র গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে, সীতাকে নিয়ে চলে গেল একেবারে খিদিরপুর এলাকায়। তারপরেই দেখা গেল, ঋজুস্বাস্থ্য দীর্ঘদেহী এক পুরুষ, তার সঙ্গে যৌবন-টলটলে একটি রূপসী মেয়ে, রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে ঘুরছে। তাদের কথার ভাষা বাজারি হিন্দী। কিন্তু উর্দুর টান আছে। দুজনের গলাও ভারি মিষ্টি। মেয়েটির গান শুনলে আর ভঙ্গি দেখলে তো বুকের রক্তই নেচে ওঠে।

লেগে গেল ভিড়। পয়সা পড়তে লাগল ভাল। এক মুসলমান হোটেলের সামনে, মৌলবী সাহেবের মত একজন ডেকে, ওদের একটি গজল গাইতে বলল। গান শুনে তো, তওবা! তওবা! খোদার দোয়া না থাকলে এরকম হয় না। খুশি হয়ে পাঁচটা টাকাই দিয়ে দিল।

অন্য ধরনের লোকেরও অভাব ছিল না, যারা শিস্ দিল, সীতাকে দেখে নানারকম আওয়াজ দিল। বিশ্বামিত্র জানে, ইতরজনরা ওরকম একটু-আধটু করবেই। সকলের রসগ্রহণের ক্ষমতা বা প্রকাশ এক রকমের হয় না।

সারাদিনশেষে, সন্ধ্যের ছায়া নামার পরে, গা-ঢাকা দিয়ে, ঘরে ফিরে দেখা গেল, এক দিনের আয় তিরিশ টাকার ওপর। রামকুমার আকর্ণ হেসে বলল, 'আজ মসালা মা-মাংস আর ভাত।'

কিন্তু আনন্দ করবার উপায় আছে কী? তারপরই আবার দেখা গেল, রামকুমারের স্যার সীতাকে হাত পা কোমরের নানান প্যাঁচ-

পয়জার শেখাচ্ছে। সে ভেবেই পায় না, পেট হাত কাঁধের মাংসপেশী এমন করে কাঁপানো নাচানো যায় কী করে। রামকুমার আড়ালে চেষ্টা করে দেখেছে, অসম্ভব! আর একবার জন্মে আসতে হবে।

বিশ্বামিত্র যে কেবল ভারতীয় নৃত্য-গীত শেখায়, তা না সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী নৃত্য-গীতের তালিমও চলছে, আর সেই সঙ্গেই চলল নতুন টাকা রোজগারের পন্থা, নানা এলাকায় গান গেয়ে বেড়ানো। বিশ্বামিত্রর লগ্নপতি দ্বাদশে ব্যয়স্থই হোক আর যাই হোক, দিনকালের চেহারাটা একেবারে উঞ্ছবৃত্তি দিয়ে ঢাকা না, মোটামুটি চলে যাচ্ছে।

এর পাশাপাশি গোলমালটা যেখানে তা হল সীতার মন। বিশ্বামিত্র যে ধাতুর পুরুষই হোক, সীতা মেয়ে হিসাবে অনেকটা প্রকৃতির কাছাকাছি। মাঝে মাঝে ওর মন খারাপ হয়, নাচ গান শিখতে ভাল লাগে না। বিশ্বামিত্রর মুখের দিকে দুর্জয় অভিমান নিয়ে তাকিয়ে থাকে। বিশ্বামিত্র বোঝে, কিন্তু যা নেই, তা নিয়ে ওর মাথাব্যথাও নেই। তবে শেষ পর্যন্ত একটু হাসি-ঠাট্টা করে অবহাওয়াটা সামলে নিতেই হয়।

বছর খানেক এভাবে চলবার পরে বিশ্বামিত্র একদিন সীতাকে নিয়ে মনুমেণ্টের কাছাকাছি বিকাল ঘেঁষে আসর জমিয়ে ফেলল। ব্যাপারটা করেছিল ভেবে-চিন্তেই। বৈকালিক ভ্রমণকারী আর অপিসের ছুটি-পাওয়া নানান ধরনের লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিল। করতে দেরিও হল না।

গান শেষ করে, টাকা সংগ্রহ করে চলে যাবার মুখে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির সামনে থেকে এক স্যুটেড-বুটেড মাঝবয়সী লোক এগিয়ে এসে হিন্দীতে বললেন, 'আমি একটু তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ভদ্রলোক পাছে অন্য ধরনের কথাবার্তা বলেন, তাই বিশ্বামিত্র প্রথমেই গম্ভীরভাবে ইংরেজিতে বলল, 'কি বলতে চান, বলুন?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বিশ্বামিত্রর দিকে তাকালেন। এবং ইংরেজিতেই বললেন, 'না না, আমি আপনাদের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে চাই না। আমি কি আপনাদের আস্তানায় গিয়ে দেখা করে কথা বলতে পারি?'

বিশ্বামিত্র বলল, 'একটু অসুবিধে আছে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তা হলে, আপনি কি আমার সঙ্গে এসে দেখা করতে পারেন? এই আমার কার্ড।' ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে বারে বারেই সীতার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। আবার বললেন, 'আপনি যদি আগামীকাল আসেন, বেলা দুটোর পরে, সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে, যখন খুশি কার্ডের ঠিকানায় আসতে পারেন।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'আসব।'

সীতাকে নিয়ে ও বিদায় নিল। বাড়িতে ফিরে আলোর সামনে ভাল করে কার্ড দেখল। বড় করে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, 'অ্যানিটা'। নিচে একটি নাম লেখা, 'এন. কে. সিনহা'। দু-পাশে অফিসের এবং বাড়ির ঠিকানা এবং টেলিফোন-নাম্বার। 'অ্যানিটা' নামটা পড়েই চোখের সামনে নিওন সাইনের লেখাটাও ভেসে উঠল, বারে বারে জ্বলছে নিভছে আর রঙ বদলাচ্ছে, এবং তার নিচেই জ্বল-জ্বল করে জ্বলছে, 'বার। ওপন্ টিল মিডনাইট।' বিশ্বামিত্র মনে মনে হাসল। যাক, ও যা চেয়েছিল তাই ঘটতে চলেছে। সীতা যখন জানতে চাইল, ব্যাপারটা কী, বিশ্বামিত্র ওর দিকে নিরীক্ষণ করে কয়েক সেকেণ্ড দেখে বলল, 'এসো, তোমাকে একটু অন্য সাজে সাজাই।'

বলেই, শিশু যেমন তার পুতুলকে ধরে সাজাতে আরম্ভ করে, তেমনিভাবে ওর গা থেকে যাযাবরী সাজের ঘাগ্‌রা কাবুলি ওড়না আর বড় বড় কাঁচের মালা নিজের হাতে খুলে নিল। বিশ্বামিত্র

ওকে নানা ভাবে পোশাক পরিয়ে, যাকে বলে টেস্ট নেওয়া, অনেক বার করেছে, তার জন্য কিছু শস্তা দামের কাপড় দিয়ে নিজের পছন্দ মত ডিজাইনের পোশাকও করিয়ে রেখেছে। ব্রেসিয়ার আর প্যান্টির ওপরে একটি খাটো সেমিজ পরালো, তার ওপরে চাপিয়ে দিল পাতলা ফিনফিনে লাল রঙের একটি স্লিভলেস্, দীর্ঘ গাউন, যা পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে দিল। চুলের বিনুনি আর সঙ্গে জড়ানো ফলস্ খুলে দিয়ে নিজের হাতে বাঁকা সিঁথি কেটে ঘাড়ের একটু নিচে অবাধ চুলটাকে আঁচড়ে সেট করে দিল, কিলিপ গুঁজল কয়েকটা এখানে সেখানে।

রামকুমার রান্না করবার এক ফাঁকে এসে দেখে বলল, 'আরে, এটা আবার কে?' বলে সামনে এসে আকর্ণ হেসে বলল, 'স্সা, আমি ভেবেছিলাম কোন মেমসাহেব এসেছে মাইরি। দারুণ, বুঝলে সীতাদি!'

বিশ্বামিত্র ঘাড় দুলিয়ে বলল, 'অনেক কিছুই দেখতে পাবে রাম না—, থুড়ি, কুমার—সবে তো কলির শুরু।'

এ-সব ব্যাপারে গম্ভীর কেবল সীতা। ওর যেন কোন উৎসাহ নেই, মুখ ভার, চোখে অভিমান। ঘরে বেঞ্চির ওপরে কাঠের পুতুলের মত বসে রইল। এখন ও মোটামুটি ভাল বাংলাই বলতে পারে, তবু বিশ্বামিত্র- ওকে ইংরেজি আর হিন্দীতেও কথা বলায়। সময় বুঝে ঠিক মত কথা বলতে হবে। এখন ও বিশ্বামিত্রকে তুমি এবং মিতা বলে ডাকে। বলল, 'ইনসিডেন্টটা কী জানতে চাইলাম, তা না বলে এ ভাবে পোশাক পরাবার মানে কী?'

বিশ্বামিত্র একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'মহড়া দিয়ে রাখছি। যা করি, জানবে, তার মানে আছে। আশা করছি, আর পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে না! এতেও যদি না হয়, এবার রাস্তায় একদিন চৌরঙ্গির কাছাকাছি একটা ওয়েস্টার্ন নাচ-গান লাগিয়ে দেব।'

'কিন্তু আমার এ-সব একটুও ভাল লাগছে না।' সীতা বলল।

বিশ্বামিত্র সীতার পাশে বসে বলল, 'বোকা, টাকা রোজগার করতে হবে না? এত খেটে শিখলে কেন? কাজ গোছাতে হবে তো!'

সীতা খানিকটা ফুঁসে ওঠার মত বলল, 'কী কাজ গোছানো? আমি কোন কাজ গোছাতে চাই না। কী হবে আমার কাজ গুছিয়ে? ইজ দিস লাইফ?'

বিশ্বামিত্র জানে, সীতার যুবতীধরম প্রাণ কী চায়। কিন্তু সেদিক থেকে ওর অনুভূতি মৃত। আপাতত ঠাণ্ডা করার জন্য বলল, 'য়ু উইল সি, হোয়াট লাইফ ইজ! দেখবে, জীবনে যা চেয়েছ সবই পেয়েছ। হয়তো তোমার জীবনে একজন খাঁটি সুন্দরলাল আসবে—'

সীতা লাফিয়ে উঠে, চিৎকার করে প্রতিবাদ করল, 'আমি আমার জীবনে কোন সুন্দরলালকে চাই না, আর তোমার মুখ থেকে এ-সব আনন্দের কথাও শুনতে চাই না।'

বলে, ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। বিশ্বামিত্র মিট মিট করে নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

গভীর রাত্রে হঠাৎ বিশ্বামিত্রর ঘুম ভেঙে গেল। সে শুনতে পেল, করুণ নিচু স্বরে কে গান করছে। অন্ধকারে ঘরের অন্যদিকে তাকিয়ে বুঝল, সীতা গাইছে। গান গাইছে, আসোয়ারি সুরে, 'এই ভুবন ভরিয়া আঁধারে আমাকে/রাখিয়া গিয়েছ একেলা।'....বিশ্বামিত্রর বড় প্রিয় গান, কষ্ট করে সীতাকে শিখিয়েছে। সীতার গলাও মিষ্টি, গায়কীও চমৎকার। একে নিতান্ত গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে হয় নি, সীতার ভিতরটা একেবারে ফাঁকা ছিল না। কিন্তু এ গান ঠিক এ ভাবে, নিজের জন্য না গাইলে, এর প্রকৃত সৌন্দর্য আর রস পাওয়া যায় না। সীতা হয়তো গভীর দুঃখে গাইছে, কিন্তু বিশ্বামিত্র

মনে মনে খুশি হল। ঠিক এমনটিই ও চেয়েছিল। ও ওর জেগে যাওয়াটা জানতে দিল না,. চোখ বুজে শুয়ে রইল। এক ঘরের এক পাশে ও শোয়, অন্য পাশে সীতা। দরজা-খোলা রান্নাঘরে রামকুমার।

বিশ্বামিত্র পরদিন তিনটের সময় মিঃ এন. কে. সিন্‌হার সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করল, এবং যা ভেবেছিল তাই। অ্যানিটায় রাত্রি ন'টা থেকে বারোটা পর্যন্ত গান হয়, ইণ্ডিয়ান আর ওয়েস্টার্ন। মিঃ সিন্‌হা চান, বিশ্বামিত্র আর সীতাকে সেখানে টেস্ট করতে। ওদের গান তাঁর খুব ভাল লেগেছে।

বিশ্বামিত্র বলল, সে গাইবে না, শ্রোতাদের সামনেও যাবে না, সীতাই গান করবে, ও সামনে থাকবে। এবং জানিয়ে দিল, সীতা ইণ্ডিয়ান আর ওয়েস্টার্ন দুরকম গানই জানে. কিন্তু দুদিনের বেশি টেস্ট নেওয়া চলবে না, এবং কী পোশাকে আর চেহারা নিয়ে সীতার আবির্ভাব হবে সেটাও ঠিক করে দেবে বিশ্বামিত্র। ও নিজের পরিচয় দিল বাঙালী খৃষ্টান হিসাবে, নাম বলল হার্বার্ট মিল, আর সীতার নাম বলল মিস্ প্রেম বাকায়া। মিঃ সিন্‌হা মিস্ শুনে একটু অবাক হলেন, বললেনও সে কথা। বিশ্বামিত্র হেসে বলল, 'শী ইজ হার ওন মিসট্রেস্।'

মিঃ এন. কে. সিন্‌হার চোখে লোভের ঝিলিক, সেই সঙ্গে বিস্ময়। বললেন, 'আপনাদের দুজনকেই রহস্যময় লাগছে। মিস্ প্রেম বাকায়া লেখাপড়া জানেন কেমন? অবিশ্যি লেখাপড়ার সঙ্গে নাচ-গানের কোন সম্পর্ক নেই. নিতান্ত কৌতূহলবশেই জিজ্ঞেস করছি।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'শুধু জেনে রাখুন, মিস্ প্রেম ইংরেজি হিন্দী বাংলা, তিন ভাষাতেই কথা বলতে এবং গাইতে পারেন। গলার স্বর তো আপনি শুনেছেনই।'

'চমৎকার!' মিঃ সিনহা বললেন।

টেস্টের পরে টাকা-পয়সার কথা হবে এই সাব্যস্ত হল।

সাত দিন পরে প্রথম টেস্ট। বিশ্বামিত্র সীতাকে তৈরি করেই নিয়ে গিয়েছিল। নিজে রইল আড়ালে, দশজনের মধ্যে একজন দর্শক আর শ্রোতা হয়ে। মিঃ সিন্‌হা নিজে পরিচিত করালেন মিস্ প্রেম বাকায়াকে। অভিজাত পানশালা, সকলেই মিস্ প্রেমকে দেখে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাল। মিস্ প্রেম মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সকলের প্রতি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হেলো, গুড ইভিনিং। শুভ-সন্ধ্যা !'

তারপরে সীতা প্রথমেই পপ্‌ ধাঁচের একটি হিন্দী গান গাইল। প্রচণ্ড হাততালি। তারপরে ঠুম্‌রির ঢঙে, খাঁটি না। উল্লাস আরো জাগল। তারপরেই ও গাইল পাশ্চাত্ত্য আধুনিক গান। পানশালা ফেটে পড়ল।

ফেটে পড়তে লাগল দিনের পর দিন। এক দিনের টেস্টেই চাকরিতে বহাল। আপাতত হাজার টাকা বেতন, যাতায়াতের খরচ, কিছু খানাপিনা তো আছেই। সীতার চারপাশে মৌমাছিদের ভিড় আর গুঞ্জন। হোটেলে, বারে, রেস্তোরাঁয়, সকলের মুখে মুখে মিস প্রেম-এর নাম। 'অ্যানিটা'র এনট্রেন্সে বড় বড় করে ইংরেজিতে লেখা থাকে, 'আজ রাত্রেও হয়তো আপনি মিস প্রেম বাকায়ার গান শুনতে পাবেন।'

স্বভাবতই, প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই, মধ্য-কলকাতায় একটি ছোটখাটো ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে হল। দু'মাসের মাথাতেই, সকালের দিকে এক ভদ্রলোকের আবির্ভাব হল, হোটেলের মালিক নন, কিন্তু অ্যানিটার থেকে অনেক বড় বার-কাম-রেস্তোরাঁর মালিক। তাঁর ওখানে ওয়েস্টার্ন সঙ্গীত আর বাদ্য ছাড়া চলে না। কেন না, ওখানে খদ্দেররা জোড়ায় জোড়ায় নাচতে আসে। অফার দিলেন, বারোশো টাকা মাইনে, যাতায়াতের গাড়ি, রাত্রের ডিনার, এবং চারশো টাকা বাড়ি-ভাড়া। বিশ্বামিত্র রাজী হয়ে গেল।

সিন্‌হার সঙ্গে ও কোন সময়ের চুক্তি করে নি, কিন্তু এখানে কম পক্ষে ছ'মাস চুক্তি করতে হল।

সীতার আবার পোশাক বদলালো। হ্রস্ব হল না, বরং শরীরের ওপর অংশকে বেশি অনাবৃত রেখে, নিচের দিক অনেকখানি আবৃত রইল, যদিও মাঝে মাঝে পোশাক বদলানোও চলল। 'অ্যানিটা' থেকে 'ওয়াটারফ্রণ্টে' জমল আরো বেশি। বিশ্বামিত্রর উপদেশগুলো সীতা মনে রেখেছিল। ওয়াটারফ্রণ্টে অল্প-সল্প শরীর নাচাল, হাসি এবং হাত তোলা ইত্যাদিতে আসর জমল প্রচণ্ড। মিস্ প্রেম-এর বিরাট ছবি ওয়াটারফ্রণ্টের বড় দরজায়।

ইতিমধ্যে বিশ্বামিত্র আর একটা কাজ করল। শীতের সময় যে সব বড় বড় মিউজিক কনফারেন্স হয়, এরকম কনফারেন্সের এক কর্তা-ব্যক্তিকে ধরে আধ ঘণ্টার একটা প্রোগ্রাম আদায় করল। আর একটা কনফারেন্সে আধ ঘণ্টার নৃত্য। কোনটার জন্যই টাকার কোন প্রশ্নই নেই। শিল্পী পরিচিত হতে পারলেই ধন্য।

কিন্তু গানের আধ ঘণ্টার জায়গায় দেখা গেল, শ্রোতাদের অনুরোধে দেড় ঘণ্টা গাইতে হল, এবং অনেক গুণী ওস্তাদেরা শিল্পীর যথেষ্ট তারিফ করলেন, আশীর্বাদ করলেন। নাচের ব্যাপারেও ঘটল প্রায় এক। ব্যাপার প্রায় সেই প্রবাদবাক্যের মত, খোদা যব্ দেতা, ছপ্পর ফাড়কে দেতা। মিস প্রেম বাকায়া সম্পর্কে কাগজে সঙ্গীত-সমালোচকের ভূয়সী প্রশংসা এবং ভবিষ্যতে উজ্জ্বল আশা ঘোষিত হল। সীতার জগৎ ক্রমে বিস্তৃত।

জগৎ ক্রমে বিস্তৃত, কিন্তু সীতার মনের জগতের বিস্তৃতি হয় নি, বরং ওর ভিতরে একটা হতাশা বাড়ছে। আরো বড় ফ্ল্যাট, ভালো ভাবে থাকা, আরাম বিশ্রাম, সবই হচ্ছে, কিন্তু ওর ভিতরটা থর থর করছে। ওকে এখন প্রেম নিবেদন করার লোকের অভাব নেই, ধনী গুণী সুপুরুষ যুবা প্রৌঢ় সকলেই ওকে প্রেম নিবেদন করে, আর ভ্রূকুটি চোখে বিশ্বামিত্রকে ও জিজ্ঞেস করে, 'তোমাকে চিনতে

হলে আমার কী রকম চোখ থাকা দরকার বল তো? কোন মন্ত্র-টন্ত্র আছে নাকি?'

বিশ্বামিত্র হেসে বলে, 'কপাল সীতা, কপাল, যার লগ্নপতি দ্বাদশে ব্যয়স্থ, তার কিছু হয় না। তা ছাড়া, মেয়েদের নিয়ে সংসার করা আমার পোষাবে না, চেষ্টা করে আর একটা মিস প্রেম বাকায়া বানাতে পারি।'

সীতার রাগ অভিমান কান্না, কোন কিছুই বিশ্বামিত্রকে ফেরাতে পারছে না দেখে সীতার ভিতরের হতাশা বাড়ছে।

ইতিমধ্যে, ওয়াটারফ্রন্টের ছ'মাস শেষ হতে না হতেই পাঁচ তারকা বিশিষ্ট শহরের আন্তর্জাতিক হোটেল থেকে সীতার ডাক এল। হোটেলের নাম, ই. আই. আই। ইস্ট ইণ্ডিয়ান ইণ্টার-ন্যাশনাল হোটেল। ওয়াটারফ্রন্টের ছ'মাস শেষ হতেই বিশ্বামিত্র সীতাকে ই. আই. আই-তে নিয়ে গেল। সেখানে প্রধানত ক্যাবারে নর্তকী হিসাবে যোগ দিল। আড়াই হাজার টাকা বেতন ছাড়াও, অন্যান্য সুবিধাগুলি বেশি মাত্রায় জুটল।

সীতা এখন অনেক সময়, একলা বা কোন পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে চলাফেরা করে। শহরের ভি. আই. পি. থেকে শুরু করে মিলিটারি বড় অফিসাররাও এখন ওর ছায়ায় ছায়ায় ঘোরে। বিশ্বামিত্রর মনে হল, এবার বোধহয় ওর বিদায় নেবার সময় হয়েছে।

এ চিন্তাটা যখন মাথায় এল, তখনই সীতার রূপমুগ্ধ একজনকে দেখে ও থমকে গেল। নলিনাক্ষ মুখুজ্যের একমাত্র বংশধর, নবীন মুখুজ্যে, আগুনের সামনে পতঙ্গের মত কাঁপছে। অতএব কিংকর্তব্য? কর্তব্য একটাই, আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো!

বিশ্বামিত্রর শুরু হল সীতাকে নিয়ে নতুন নাটক। এখন পুতুল খেলার নাটক। সবই বিশ্বামিত্রর হাতে আছে, হাতের মুনশিয়ানাটা ঠিক করে কাজে লাগাতে হবে, সুতো চালাচালি টানাটানিতে গলদ থাকলে চলবে না, খেলায় গলতি হয়ে যাবে। ও প্রথমে নবীন

সম্পর্কে আরম্ভ করল গুণগান, ধনী তো বটেই, কিন্তু সচ্চরিত্র আর একটু বোকা। বিয়ে করে সুখী হয় নি, বউটা ভাল না। বাপ লোকটি এত কৃপণ, ছেলেটাকে সুখী হতে দেয় না। এমন লোকের প্রতি সীতার মায়া-মমতা থাকা উচিত। বন্ধু যদি করতে হয়, এমন লোককেই করা উচিত। তবে তা বলে সীতা যেন নবীনের হাতে নিজেকে একেবারে সঁপে না দেয়, আর বিশ্বামিত্রর নামটা ওর কাছে না-বলাই ভাল।

শুরু হল খেলা। নিজের স্বর্গত পিতৃদেবের কথা স্মরণ করে, জীবনে বোধহয় এই প্রথম মুখ কঠিন করে নিষ্ঠুর চোখে দৃষ্টিপাত করে বলল, 'ভানুমতীর খেল! লাগ্ ভেল্‌কি লাগ্।'

সীতার জীবনের এই সময়টার মধ্যে ওর যে কোনরকমই পরিবর্তন হয় নি, তা না। স্বাভাবিকভাবেই যেগুলো ও আরম্ভ করেছে, তা হল ছলনা, কিছু রঙ্গিণীবৃত্তি, প্রেমে পড়া ব্যক্তিদের অনায়াসে মিথ্যা কথা বলা, এবং সব থেকে যেটা বড়, ও মোটামুটি টাকা চিনতে শিখেছে, টাকাকে একটু ভালও বেসেছে, কেন না টাকা অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয়। ওর মাইনের টাকাটা বিশ্বামিত্রের হাতে দিলেও তার থেকে খরচ সামান্যই হয়। সীতার নিজের কোন খরচই নেই, ভাগ্যবতীর বোঝা এখন কলকাতার ঈশ্বররাই বহন করছেন, তা ছাড়া প্রেজেনটেশানের তো কথাই নেই।

নবীন সম্পর্কে বিশ্বামিত্র সজাগ করিয়ে দেবার পরে ও নবীনের সঙ্গে মিশতে লাগল নিজের প্রবৃত্তিগুলো নিয়েই। ইস্ট ইণ্ডিয়ান ইণ্টারন্যাশনালে নবীনের বারো মাস স্যুইট ভাড়া করা আছে, সেখানে নানা মেয়ের আনাগোনা। বিশ্বামিত্র নির্দেশ দিল, সব ঝুট-ঝামেলা হটাও। নবীনটা বোকা, বুঝতে পারছে না।

নবীন বোকা না, কিন্তু সীতা নামক আগুনের কাছে একেবারে মথ্ হয়ে গিয়েছে, পাখা কাঁপছে থরো থরো। এতকাল নানান মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, যাদের তেমন পরিচয় ছিল না।

মিস্ প্রেম বাকায়া মানে, কলকাতার বহু বড় ইমারতের শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষেও, অনেক মাথা ঘুরছে। আম্রপালী বলে কথা। মিস্ প্রেম বাকায়া মানে, আধুনিক যুগের রাজনর্তকী, তার প্রেম রাজার ভাগ্যেই জোটে।

নবীন সেই রাজার ভাগ্য ছিনিয়ে নিতে চাইল। পশ্চাতে বিশ্বামিত্রর ইন্ধন, খুব সাবধানে। কেন না, এবারকার খেলায় সীতাকেও ঘুঁটি হিসাবে চালতে হচ্ছে।

বিশ্বামিত্র দেখল, শহরের শিরে করাঘাত। অর্থাৎ শীর্ষসমাজে। মিস্ প্রেমের জন্য সকলেরই হাহাকার। হাহাকার তো নলিনাক্ষ মুখুজ্যের পরিবারেও! নবীন তো হোটেল আর মিস্ প্রেমের ফ্ল্যাট ছাড়া, পৃথিবী ভুলে গিয়েছে। মিস্ প্রেমের জন্য নতুন গাড়ি, নতুন খাঁটি জড়োয়ার গহনা, হীরার নেকলেস, প্রেমোপহারের পর উপহার।

সীতার কাছেই বিশ্বামিত্র শুনতে পায়, নবীনের স্ত্রী সীতার কাছে টেলিফোন করে পায়ে ধরে কেঁদেছে। এমন কি নলিনাক্ষ মুখুজ্যে মা বলে ডেকে আদর করেছে। বিশ্বামিত্রের এক কথা, সীতা, নবীনটাকে বাঁচাও। এমন ছেলে হয় না। বাপটা শকুন, বউটা ডাইনি। বাগে পেলে হয়তো নবীনকে মেরেই ফেলবে। বাঁচাও। তুমি তো নবীনকে দেখছ, এমন সরল প্রেমিক পুরুষ তুমি আর দেখেছ? আমি চাই, ও তোমার জন্য সর্বস্ব উজাড় করে দিক। ও হিন্দু, ও আর বিয়ে করতে পারে না। কিন্তু ও যদি মুসলমান হয়ে তোমাকে বিয়ে করে, তুমি তাও করতে পার, কিন্তু ওকে বাঁচাও।

আসলে মনে মনে বলছে, 'জ্বালাও জ্বালাও, আরো জ্বালাও, আমার খেলা তাড়াতাড়ি সাঙ্গ করি।'....

সীতা দ্বিধাহীন না, তথাপি ও একটি মেয়ে। নবীনকে ও

অস্বীকার করতে পারছে না। একটা মানুষ তার সব কিছু এমন করে উজাড় করে দিতে থাকলে তার প্রতি মনের মধ্যে একটা প্রীতি অনুকম্পা সঞ্চারিত হয়। সেটা ভালবাসা কতখানি, জিজ্ঞাসার বিষয়। তা ছাড়া, জীবনে একটা নীড় ও নিরাপত্তা কে না চায়? সীতার অবচেতনে সেটা কাজ করছে. বিশ্বামিত্র ওর কথা শুনে বুঝতে পারে। সীতার মনে দীর্ঘদিনের একটা হতাশাও আছে, দেহ-মনের প্রশ্ন আছে, যা ওকে নবীনের সঙ্গে সত্যি নিবিড় করে তুলল।

কয়েকদিন পরেই বিশ্বামিত্র সেই আগুনের মত দুর্জয় সংবাদ শুনল, নলিনাক্ষ মুখুজ্যে নিজের রিভলভার দিয়ে, নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছে। কারণ তার পুত্র ঘোষণা করেছে, সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মিস্ প্রেমকে বিয়ে করবে।

বিশ্বামিত্রকে সংবাদটা টেলিফোন করে হোটেল থেকে সীতা জানাল। বিশ্বামিত্র তখন ফ্ল্যাটে। জিজ্ঞেস করল. 'নবীন কী বলছে? খুব কষ্ট বা ভয় পাচ্ছে কী?'

সীতা বলল. 'সে রকম মনে হচ্ছে না। ড্রিংক করছে আর বলছে, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'তুমি এখন ওর কাছেই থাকো, তুমি ছাড়া ওর কে-ই বা আছে।'

সীতার স্বরে কেমন একটা দ্বিধা. বলল, 'আমার ভাল লাগছে না।'

'হ্যাঁ, একটা দুর্ঘটনা তো। সব ঠিক হয়ে যাবে, ভেবো না।'

বিশ্বামিত্র টেলিফোন লাইন ছেড়ে দিয়েই চিৎকার করে ডাকল, 'রামচন্দ্র।'

রামকুমার ছুটে এসে বলল. 'দেখুন স্যার, এতকাল হয়ে গেল, তবু আপনি—'

'থুড়ি থুড়ি থুড়ি, মিঃ রামকুমার।' বিশ্বামিত্র বলল, 'শোন রামকুমার, আমি চললাম, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?'

'কোথায় ?'

'হয়তো আমাদের সেই পুরনো ডেরাতেই, যদি সেটা খালি পাওয়া যায়।' বিশ্বামিত্র বলল, 'তা না হলে হট্টমন্দির তো আছেই।'

রামকুমার অপরিসীম বিস্ময়ে চোখ গোল করে বলল, 'এই বাড়ি-ঘর ছেড়ে আবার সেই এঁদোয় ? সীতাদির কি হবে ?'

বিশ্বামিত্র বলল, 'তা আমি কী করে জানব ? একদিন সে হঠাৎ আমার কাছে এসেছিল, আজ আমি হঠাৎ চলে যাচ্ছি, এর বেশি তো কিছু না।'

'কিছু না ?' রামকুমার তোতলা হয়ে গেল. 'ঐ যে এ-এ-এত শিখিয়ে পড়িয়ে—'

'ওটা কিছু না, যে যার কপালে করে খায়, বাকী সব নিমিত্ত মাত্র।' বিশ্বামিত্র বলল, 'কিন্তু রামকুমার, আমার আর সময় নেই. চললাম।'

রামকুমার আরো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, এই এক বস্তরে চলে যাবেন ? কিছুটি নেবেন না ?'

'না, কিছুই নেবো না। যতদিন নেবার ছিল নিয়েছি। হঠাৎ একদিন একটা খেয়াল মাথায় চেপেছিল, সেই খেয়ালের খেলা সাঙ্গ। অতএব নটে গাছটি মুড়লো, আমার কথাটিও ফুরালো। চলি রাম চ—থুড়ি—কুমার।'

বিশ্বামিত্র বেরুবার মুখে খানসামা কী জিজ্ঞেস করতে এল, ও হাত তুলে বলল, 'যা বলবার সব মেমসাহেব এসে বলবেন, আমি একটু বেরোচ্ছি !'

রামকুমার যুবতী ঝি মুন্নার সামনে দাঁড়িয়ে গায়ে একটা জামা চাপাতে চাপাতে বলল, 'চললাম মুন্না !'

মুন্না জিজ্ঞেস করল, 'কাঁহা যাতা হ্যায় ?'

'যিধারসে খেলা শুরু হয়েছিল।' বলেই দৌড়। বিশ্বামিত্র

তখন রাস্তায়। ও জনারণ্যে মিশে যাবার আগেই রামকুমার ওকে ধরে ফেলল, বলল, 'দুনিয়াটা স্‌সা স্‌সত্যি আজব।'

হ্যাঁ, প্রকৃতই দুনিয়া আজব। আসলে দুনিয়া আজব না, আজব মানুষ, দুনিয়াকে আজব করার অন্ধি-সন্ধি তারই হাতে। মানুষ সেটা অনেক সময় মহামানব হয়েও করে, কিন্তু প্রকৃতি বোধহয় অন্তরালে হাসেন, তা না হলে রামকুমারের গালে বিশ্বামিত্রর বিরাশিসিক্কা ওজনের থাপ্পড়টা বোধহয় পড়ত না।

বিশ্বামিত্রর সৌভাগ্য, ওর সেই সুড়ংটা ও ফিরে পেয়েছিল, কারণ ওটা রাস্তার কুকুর আর গৃহহীন গরুদের আশ্রয় হয়েছিল। কলকাতায় এটা আশাতীত ব্যাপার, কিন্তু কোন-কোন এলাকায় কলকাতায় রাস্তার ওপরে এরকম আশাতীত ব্যাপার দেখা যায়। সুড়ংটাকে ও আবার আগের মতই সাজিয়ে নিয়েছে। কিন্তু রামকুমারের একটা দোষ, সে কথায় কথায় সীতার কথা তোলে। বিশ্বামিত্র প্রথম তেমন খেয়াল করে নি, পরে বুঝতে পারল, নামটা কোথায় তাল ভেঙে দিচ্ছে, সুর কেটে দিচ্ছে। তখনই ও রামকুমারকে বলে দিয়েছে, বারে বারে সীতার নাম যেন সে না করে। করতে হয়, মনে মনে, বিশ্বামিত্রকে শুনিয়ে না।

রামকুমার তেমন এলেমদার না, যে আবেগবশত নামটা মনে এলে না বলে পারবে। অতএব সে বলেই ফেলে। বিশ্বামিত্রর ধমক খেয়ে থেমে যায়। অবাক হয়ে ভাবে, স্যারের মাথাটা তো এত খারাপ ছিল না!

আজ একেবারে সপাটে এক থাপ্পড়, আর ধমক, 'বলেছি না, তুমি সীতার নাম আমার কাছে করবে না!'

রামকুমার অপার বিস্ময়ে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, তারপরে ওর চোখ দুটো টলটল করে উঠল। বিশ্বামিত্র দেখল,

আর মনে হল, ঝটিতি ওর বুক থেকে কিছু একটা ছুটে গলার কাছে আসছে, এবং চোখ দুটো ঝাপসা করে দেবে। ও তাড়াতাড়ি ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

সীতার ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে আসার পর সেই জগৎটা সম্পর্কে ও একেবারে নির্বিকার হয়ে গিয়েছিল। কোন কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা জাগে নি। তবে এখন আর জ্বালাও জ্বালাও বলে না, নিজেকেই জিজ্ঞেস করে, 'কী জ্বালালাম?'

জ্বলেছে বোধহয় প্রাণের আসল চুল্লীটাই। মহাপ্রাণীর দুটি আগুনের জ্বালা অতি প্রত্যক্ষ, বড় নিষ্করুণ। একটি জঠর, আর একটি হৃদয়—যে নামই তাকে দেওয়া যাক। তা না হলে সীতার নামে এত জ্বালা কিসের?

কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বিশ্বামিত্র অনুমান করল, রামকুমার এতদিন পরে আজ নিশ্চয়ই ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। একটি বুক-বিদীর্ণ নিশ্বাস পড়ল। কলকাতার পথের ধারেও কিছু গাছ আছে, মনে থাকে না। এখন, এই হেমন্তে পাতা ঝরছে, যানবাহনের ঝাপটায় উড়ছে। বিশ্বামিত্র হাঁটছে।

হাঁটতে হাঁটতে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজাটা ভেজানো দেখে বুঝতে পারল, রামকুমার পাত্‌তাড়ি গুটিয়েছে। দরজাটা ঠেলে, বিশ্বামিত্রর ভিতরে ঢুকতে ইচ্ছে হল না, কিন্তু আর পথে পথেও ঘুরতে ইচ্ছা করছে না। তারপরেই হঠাৎ মনে হল রামকুমারের গলা শোনা যাচ্ছে, কারোর সঙ্গে যেন কথা বলছে।

বিশ্বামিত্র দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই থম্‌কে দাঁড়াল। মেঝেতে বসে রামকুমার। তক্তপোশের ওপর সীতা। প্রায় মিনিট খানেক কেউ কোন কথা বলতে পারল না। তারপরে বিশ্বামিত্রই প্রথম হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কী খবর মিস প্রেম বাকায়া, তুমি এখানে?'

সীতা দাঁড়াল, বলল, 'এখানে আমার নাম সীতা চিত্রকর। যদিও শুনলাম, এখন নামটা শুনলেও নাকি আপনার ঘেন্না হয়।'

বিশ্বামিত্র চকিতে একবার রামকুমারকে দেখল। রামকুমার উঠে অন্যদিকে সরে গেল। বিশ্বামিত্র সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার খবর কী বল ?'

সীতার ঠোঁট বক্র হল। ও এসেছে শাড়ি পরে, কপালে লাল ফোঁটা আঁকা, বলল, 'আমিই আপনার খবর নিতে এলাম, আমার খবর তো সবাই জানে। অবিশ্যি আমার ভাগ্য, এখানেই আপনাকে পেলাম। কিন্তু আমার নাম শুনলে আপনার এত রাগ হয়, জানতাম না। তবু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, এরকম হঠাৎ না বলে-কয়ে চলে এলেন কেন ?'

বিশ্বামিত্র লক্ষ্য করেছে সীতা ওকে 'আপনি' করে বলছে। বলল, 'সে কথা পরে বলছি। নবীনের খবর কী বল ?'

সীতা বলল, 'তার খবর তো আপনারই ভাল জানার কথা, আপনিই আমাকে তার কথা বলেছিলেন।'

বিশ্বামিত্র বলল, 'তা বলেছিলাম, কিন্তু এখন তার অবস্থা কী, সেটা জানি না।'

'কী আবার ? তার বাবা তাকে পপার করে রেখে গেছে, সিঙ্গল্ ফার্দিংও দিয়ে যায় নি।' সীতা বলল।

বিশ্বামিত্র গম্ভীর হয়ে গেল, জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে তো ?'

'না, আপনার সে আশা পূর্ণ হয় নি।' সীতা বলল।

বিশ্বামিত্র বলল, 'আমার আশা ?'

'নয় ?' সীতা ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করল, 'প্ল্যানটা আপনিই দিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, আইনের কথা ভেবে ওটা বলেছিলাম।'

'কিন্তু নিজের অবস্থা বুঝে, নবীন আর আমাকে বিয়ে করতে পারে নি।'

সীতা বলল, 'আমার কাছেও ব্যাপারটা প্রথমেই অশুভ মনে হয়েছে। আমি ওর সবই ফিরিয়ে দিয়েছি।'

বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ফিরিয়ে দিয়েছ ?'

সীতা নির্বিকারভাবে বলল, 'কেন, ওর দেওয়া গাড়ি, অর্নামেন্টস্, সবই ফিরিয়ে দিয়েছি।'

বিশ্বামিত্র জিজ্ঞেস করল, 'ও তা ফিরিয়ে নিল ?'

সীতা একটু হেসে বলল, 'কেন নেবে না ? বেঁচে গেল, তবু দাঁড়াবার একটা চেষ্টা করতে পারবে।'

বিশ্বামিত্র সীতার মুখের দিকে তাকাল, সমীহ-মিশ্রিত বিস্ময় ওর চোখে, এবং একটা স্নিগ্ধ হাসির আভাসও। সীতা হঠাৎ মুখ নামিয়ে বলল, 'এ ঘর থেকেই তো একদিন যাত্রা করেছিলাম। পরের জিনিস ফিরিয়ে দেবার মত মনের শক্তি আমার আছে।'

বলে ও আবার বিশ্বামিত্রর দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আমার কথার জবাব এখনো পাই নি। হঠাৎ ওরকম না বলে-কয়ে চলে আসার মানে কী ?'

বিশ্বামিত্র একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'আমার কাজ শেষ হয়ে গেছলো, তাই ফিরে এলাম।'

'কী আপনার কাজ ছিল ?' সীতার স্বর শক্ত, আবার জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে কলকাতার শ্রেষ্ঠ নর্তকী আর গায়িকা করে তোলা ? আমাকে সমাজের এক বিশেষ স্তরে তুলে দেওয়া ? আমাকে সব দিক থেকে এস্টাবলিশ করা ?'

বিশ্বামিত্র একটু থেমে, হেসে বলল, 'ধরো, তাই।'

'কিন্তু কেন ? কে চেয়েছিল আপনার এই দয়া ? কে আপনার এই ভেল্‌কি দেখতে চেয়েছিল ?' দ্রুত আর উত্তেজিত স্বরে সীতা বলল।

বিশ্বামিত্র বলল, 'শোন, মানুষ কিছু ক্রিয়েট করতে চায়—।'

'কিন্তু সেই ক্রিয়েশন আমি কেন, সেটাই জিজ্ঞেস করছি, কেন

কেন কেন আমাকে এই দয়া?' সীতার স্বর রুদ্ধ, আরক্ত চোখ ভিজে উঠল।

বিশ্বামিত্র ডাকল, 'সীতা।'

'না না না, ও নাম থাক।' সীতাকে উত্তেজনায় একটু অস্বাভাবিক দেখাল, ওর গলার স্বর এখন ভাঙা, বলল, 'এ ঘর থেকে আমাকে ওখানে তুলে দিয়ে, নিজে এখানে আবার ফিরে আসা, কেন? কেন এই সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি, আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। ভেবে ভেবে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

সীতার গলা শেষ দিকে অসহায় কান্নায় ডুবে গেল, ও দু হাতে মুখ ঢাকল। বিশ্বামিত্রর এই প্রথম মনে হল, সত্যিই সীতার চোখের কোল বসা, ঝরে যাওয়া মুখটার দিকে তো ও ভাল করে তাকিয়ে দেখে নি। ওর শেষের কথায়, বিশ্বামিত্রর বুকের একটি নির্ঘাত স্থানে বিদ্ধ হল। ও এগিয়ে গিয়ে সীতার কাঁধে হাত রাখল, যে-সীতাকে আজ আর নিতান্ত পুতুল বলে ভাবা যাচ্ছে না। সান্ত্বনার স্বরে ডাকল, 'সীতা, শোন।'

সীতা অস্ফুট ভাঙা স্বরে বলল, 'শোনার আর কিছু রাখা হয় নি আমার জন্য। প্রথম যেদিন এ ঘরে এসেছিলাম, সেই দিনটা—সেই...'

সীতার কথা আবার ডুবে গেল। বিশ্বামিত্র এবার ওকে একটু নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'আসলে তুমি তো জানো, আমার লগ্নপতি দ্বাদশে ব্যয়স্থ।'

'লোক-লোককে ধাপ্পা মেরে মেরে, একটা লোক যে নিজেকেও ধাপ্পা মারতে পারে, জানতাম না।' হঠাৎ রামকুমার ঘরের কোণ থেকে বলে উঠল। তারপরেই খালি গায়ে জামা পরতে পরতে বলল, 'বেরোচ্ছি।'

বিশ্বামিত্র এত অবাক কখনো হয়-নি। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'জাহান্নামে।' বলে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বিশ্বামিত্র বলল, 'আরে, এখন গেলে কী করে চলবে? একটু চা জলখাবার—'

রামকুমার বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'আজ্ঞে স্যার, সেই জন্যই যাওয়া হচ্ছে। সীতাদির সঙ্গে পুরি, তরকারি আর জিলিপির কথাই হচ্ছিল। আমরা খাই, জিলিপির প্যাঁচ তো আর জানি না।'

বলেই হঠাৎ থেমে, আবার বলল, 'দেখি, ব্যাটা এখনও পুরি ভাজছে কী না।'

বলেই বেরিয়ে গেল, দরজাটা টেনে দিয়ে।

বিশ্বামিত্র সীতার দিকে তাকাল। সম্ভবত, রামকুমারের হঠাৎ বিস্ফোরণে, ওর কান্না একটু দমিত হয়েছে। ওর মাথা নত, নিশ্চল। বিশ্বামিত্র ডাকল, 'সীতা।'

'বলুন।'

'তাকাও, তা না হলে বলতে পারছি না।'

সীতা আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাকাল, আরক্ত চোখ ভেজা। বিশ্বামিত্রকে একবার দেখে, দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরাল।

বিশ্বামিত্র বলল, 'তোমাকে অনেক কথা বলার আছে। ভেবে-ছিলাম, সে কথা তোমাকে কোনদিন বলবার দরকার হবে না।'

সীতা তাকাল বিশ্বামিত্রর দিকে, বলল, 'আমি এলাম, তাই বলতে হবে, না?'

বিশ্বামিত্র বলল, 'ঠিক তাই। এসো, এবার সে কথাগুলোই বলি।'

বলে, সীতাকে টেনে নিয়ে তক্তপোশের ওপর বসল।

বাইরে হৈমন্তিক হাওয়ায় এখনো পাতা ঝরছে।

বেহুলা

আয়েশার সঙ্গে আমার পরিচয় কলকাতায়। আয়েশা গান। সম্প্রতি ইতিহাসে যে নতুন দেশের সৃষ্টি হলো, আয়েশা সেই বাঙলা দেশের মেয়ে। ওদের বাড়ি যদিও ময়মনসিংহের টাঙাইলে, ছেলেবেলা থেকে ঢাকাতেই থেকেছে। ওর আব্বাজান, জনাব হাবীব, ঢাকার এক কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, বিভাগ-প্রধান। ওর আম্মা একজন ইস্কুল শিক্ষয়িত্রী, বেগম আনিসা। আয়েশা নিজেও ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী, গুরু ওর নিজের আব্বাজান। হাবীব সাহেব ছাত্রীটিকে মনের মতো করে শিক্ষা দিয়েছেন, কেবল ইংরাজিতে না, বাঙলাতেও, কারণ তাঁর জবানীতে শোনাই, 'দেখ, ইংরেজি শিখেছি এক সময় কষ্ট করে, পরে চেষ্টা করেছি ভাষাটাকে অনায়াসগম্যের আয়ত্তে আনতে, কিন্তু মাতৃভাষাটাকে যে ঘুঁটে কুড়োনির মা করে রেখে দিয়েছি, সেটা খেয়াল করি নি।' খেয়াল যখন হলো, তখন আবার নতুন করে ভিন্ন পাঠ নিয়ে বসতে হয়েছিল।' অর্থাৎ পরিণত বয়সে তিনি নতুন করে বাঙলায় চর্চা শুরু করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায়, বাঙলাভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগটা কোথায়, এবং নিজের কন্যাকে বাঙলা ভাষাটাও তিনি সেইভাবেই শিখিয়েছিলেন।

আয়েশার সঙ্গে যখন আমার কলকাতায় দেখা হয়, তখন বাঙলা-দেশে যুদ্ধ চলছে। হাবীব সাহেব তখন সপরিবারে কলকাতায়

: হলেন। আয়েশা ছিল তখন য়ুনিভার্সিটির ছাত্রী। এখন বুঝতে পারি, হাবীব সাহেব যুদ্ধের সময় ঢাকায় থাকলে তাঁকে সপরিবারে কবর দেওয়া হতো। জল্লাদের তালিকায় তা-ই লেখা ছিল।

মধ্য কলকাতায়, হাবীব সাহেব যে-ফ্ল্যাটে থাকতেন, কয়েকবার তার কাছে গিয়েছি। তখন আলোচনায় বাঙলাদেশের যুদ্ধের কথা উঠতোই, কিন্তু সাহিত্য সঙ্গীত ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথাবার্তা হতো। আয়েশা এবং বেগম আনিসার উপস্থিতিও সেই আসরে ছিল নিয়মিত। কোনো বিষয়ে তর্ক লাগলে, আয়েশা সকলের ওপরে যেতো। হাবীব বলতেন, 'লক্‌লকাইয়া উঠে কন্যা, চউখ পাকাইয়া চায় তুপতুপাইয়া চলে নারী, কী অমঙ্গল হায়।' শুনে আমরা সবাই হাসতাম। আয়েশার মুখে রঙ লেগে যেতো, আয়ত চোখে লজ্জার ঝলক, বলতো, 'আহা, আব্বাজান যেন কী।'

তর্কের বীরাঙ্গনা তৎক্ষণাৎ হয়ে উঠতো একটি লজ্জারুণ ব্রীড়াময়ী তরুণী। কোন রূপটা যে আয়েশার বেশি সুন্দর, স্বভাবতই, বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে সে নির্বাচন সম্ভব না।

মনে আছে, যুদ্ধ জয়লাভের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে হাবীব সাহেব ঢাকায় ফিরে গিয়েছিলেন। যাবার সময় বার বার অনুরোধ করেছিলেন, বাঙলাদেশে কখনো গেলে ঢাকায় ওঁর গৃহে যেন অবশ্যই যাই।

বলা বাহুল্য, গিয়েছিলাম। অপারপক্ষ গিয়েছিলেন জানুয়ারী মাসে, আমি মার্চে। হোটেলে উঠেছিলাম বটে, ওঠা পর্যন্তই। অধিকাংশ দিন হোটেলে খাওয়া তো দূরের কথা, রাত্রিবাসও করতাম না। আড্ডা দিয়ে, গল্প করে, খেয়ে দেয়ে, রাত্রিটাও কারোর বাড়িতেই ঘুমিয়ে পাহাতো।

কিন্তু এসব কথা আপাতত তোলবার দরকার নেই। আপাতত আমার সমস্ত ভাবনা আয়েশার প্রতি কেন্দ্রীভূত। আয়েশাকে

যখন কলকাতায় দেখেছি, তখন ওকে ঠিক বুঝতে পারি নি, বুঝতে পারি নি বলতে বোঝাতে চাইছি, কলকাতায় বাসের সময় ওর জীবনের যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় গত হয়েছে, যার ভিতরে ওর মানসিক নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, এবং বলতে গেলে, এক তীব্র সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, যে সমস্যার মধ্যে ছিল গভীর সংশয়, তীব্র কষ্ট, কখনো বুঝতে পারতাম না, যদি আয়েশা নিজে তা কখনো না প্রকাশ করতো।

তার আগে, আমার নিজের দেখা এবং বোঝা-আয়েশার একটু পরিচয় দিই। মাঝারি লম্বা আয়েশা রঙের দিক থেকে উজ্জ্বল শ্যামা, অনুগ্র চোখা নাক, চোখ খুব বড় না, কিন্তু টানা, সাবেক পট-চিত্রের কথা মনে পড়িয়ে দেয়, এবং টানা চোখের দৃষ্টিতে সুদূরের গভীরতা, যা থেকে তার আবেগগুলো কী রূপ নিয়ে ফুটে উঠবে, সহসা ধরা যায় না। পটের চিত্রের নারীদের যদি বিম্বোষ্ঠা বলা যায়, আয়েশা তা-ই। মুখমণ্ডল ঈষৎ গোল। ওর দৃষ্টির গভীরতার মধ্যে একটি চকিত ভাব আছে, কিন্তু চোখের তারা নিয়ত চঞ্চল না। ও কুচবরণ কন্যা না বটে, চুলটা মেঘবরণ এবং ঘন। যাকে বলে সীরিয়স, ও সেই ধরনের মেয়ে, উচ্ছ্বাসপ্রবণ না, কিন্তু যথেষ্ট হাসিখুশি, এবং কৌতুক-পরায়ণাও বটে। ওর মেজাজটা অনেকটা অধ্যাপক হাবীবের মতোই।

ইতিপূর্বে, বাঙলাদেশের এক অজানা মহিলার রোজনামচা থেকে, কিছু পরিবেশন করেছিলাম। এবারও রোজনামচাই পরিবেশন করছি, কিন্তু স্থান পাত্র-পাত্রী সবই ভিন্ন, বয়সে চিন্তায় ভাবনায়, কেবল কাল অর্থাৎ সময়টা এক।

আয়েশা ওর রোজনামচার খাতাটি আমাকে দিয়ে বলেছিল, 'এটা বোধহয় আপনাকেই দেখানো যায়, আর কারোকে না।'

এ কথা ও কেন বলেছিল, আপাতত সে বিচার থাক। আমি রোজনামচার স্থানবিশেষ তুলে দেব, সব না।

১৯২১—

২৭ এপ্রিল।

'...তা-ই কলকাতাতেই এলাম। প্রথমে ঠিক ছিল, ঢাকা শহরের বাইরে গ্রামের দিকেই আমরা কোথাও থাকব। আব্বাজান তো গোড়া থেকেই আসতে চান নি, বলেছিলেন আনোয়ারদের সঙ্গে থাকবেন, খানদের সঙ্গে লড়াই করবেন। একে তো তাঁর হাঁপের টান আছে, তার সঙ্গে লো প্রেশার। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে রাজী করানো হয়েছে। আনোয়াররাই যশোরের ভিতর দিয়ে আমাদের ইণ্ডিয়া বর্ডারে পৌঁছে দেয়। আনোয়ার এখন যশোরে লড়াই করছে। যে কোনোদিন আসতে পারে।

'আনোয়ার যখন আমাদের পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেয়, আম্মা চোখের পানি চাপতে পারেন নি। চোখে পানি আমারো এসে গেছল। কেবলই মনে হচ্ছিল, আনোয়ারকে আর দেখতে পাবো তো? আল্লা জানেন। আমি তো সকলের সামনে কাঁদতে পারি না। তা হলে সবাই বেহায়া ভাববে। আম্মা তো আসলে সেই ভয়েই কাঁদছিলেন। আনোয়ারের হাতটা ধরে আর ছাড়তে চাইছিলেন না, বারে বারে বলেছিলেন, আনোয়ার বাবা, তোমাকে ছেড়ে দিতে বড় কষ্ট লাগছে। খুব সাবধানে থাকবে, সজাগ থেকে লড়াই করবে, গোলাগুলি বৃষ্টির মধ্যে যাচ্ছ। যদি সুযোগ সুবিধা পাও, একটু দেখা দিও।

'আব্বাজানের অবস্থাও ভালো ছিল না। আনোয়ার তাঁর প্রিয় ছাত্র, 'ভবিষ্যতের—লিখতে লজ্জা লাগে। আমাদের পরিবারের সবাই জানে, আনোয়ার আমার ভাবী স্বামী। দেশের অবস্থা ভাল থাকলে হয়তো এর মধ্যেই আমার কলমা পড়া হয়ে যেত। এখন সবই ভবিষ্যতের হাতে। আব্বা আনোয়ারকে শুধু বললেন, মনে রাখবে, জান তুচ্ছ না, লড়বার জন্যই জান বাঁচাতে হবে।—কিন্তু আব্বা আনোয়ারের দিকে না তাকিয়ে কথাগুলো বলেছিলেন,

জানি, আনোয়ারের মুখের দিকে তাকালে তাঁর চোখ শুকনো থাকত না।

'আমি আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম। মাথায় বড় বড় চুল, ঘাড় বেয়ে নেমেছে। বলেছে, লড়াই শেষ না হওয়া অবধি কাটবে না। ওদের বাহিনীর ও একজন ক্যাপ্টেন। আব্বা আম্মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, খুব যেন সহজভাবেই আনোয়ার বলেছিল, যাই।

'কথাটা শুনেই বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল, কিছু বলতে পারলাম না, একবার ঘাড় কাত করেই মুখ ফিরিয়ে নিলাম। মনে মনে বললাম, এস। কিন্তু চোখের পানি ধরে রাখতে পারি নি।'—

২ মে।

'কলকাতার কাগজে যুদ্ধের খবর রোজ বেরোয়। দেশের যাঁরা কলকাতার নানান জায়গায় আছেন, তাঁরা কেউ কেউ আমাদের কাছে আসেন। তাঁদের কাছেও অনেক খবর পাই। ঢাকার সাংবাদিক সামাদ ভাই কলকাতায় আছেন, এখানকার কোনো কাগজে তাঁর লেখা বেরোয়। আব্বাজানের পুরনো ছাত্র, আমাদের পার্কসার্কাসের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসেন। তাঁর বিবি বাচ্চারা সব ঢাকার কাছে এক গ্রামে নাকি আছেন, অনেকদিন সংবাদ পান নি, মন খুব খারাপ। তবু সামাদ ভাইয়া এলে ভাল লাগে। এখানকার কবি সাহিত্যিকরা অনেক তাঁর বন্ধু। তাঁদের কথা ওনার কাছে শুনি। দু একজনকে নিয়েও এসেছেন। কিন্তু কবি ধ্রুবপদ, যাঁর কবিতা বোধহয় আমি সব পড়েছি—বর্তমানকালে তিনি আমার প্রিয় থেকে প্রিয়তম কবি। তাঁর সব কবিতাই আমি পড়েছি, বেরোলেই পড়ি। ঢাকা থেকে দু'বার দুটো চিঠিও দিয়েছিলাম। প্রথমটার জবাব পেয়েছিলাম। কী সুন্দর চিঠি। আনোয়ার সেই চিঠিটা

নিয়ে নিয়েছে। ধ্রুবপদ আনোয়ারেরও প্রিয় কবি। কিন্তু দ্বিতীয় চিঠির জবাব আর দেন নি। আমার দ্বিতীয় চিঠিটার জন্য আমার নিজেরই লজ্জা করে। ভাবাবেগে মাথামুণ্ডু কতো কী যে লিখেছিলাম। উনি বোধহয় রাগ করেই চিঠির জবাব দেন নি, আমিও লজ্জায় আর লিখি নি।

'এখন কলকাতায় এসে, সামাদ ভাইয়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে জেনে, তাঁকে দেখবার জন্য মনটা উতলা হয়ে উঠলো। সামাদ ভাইয়াকে বললাম, তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসতে, আমি তাঁকে দাওয়াত করছি। সামাদ ভাইয়া বললেন, চেষ্টা করবেন। কেন না ধ্রুবপদ নাকি ব্যস্ত মানুষ।

'....আব্বার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। আনোয়ারের কোনো সংবাদ নেই। আজ জুবিদা ফুফার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবার কথা আছে, একটা ইংরেজি যুদ্ধের ছবি। তিনি আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন।'....

১১ মে

রাত দশটা।

'আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবার মতো হয়েছিল। ধ্রুবপদ— আমার কবির সঙ্গে আজ পরিচয় হল। আমাদের বাড়িতে না। সামাদ ভাইয়ার সঙ্গে কলকাতার আকাশবাণীতে গেছলাম। এমনি দেখতে, আর দু একজনের সঙ্গে পরিচয় করতে। সেইখানেই ধ্রুবপদর সঙ্গে এক ঘরে দেখা হয়ে গেল। সামাদ ভাইয়া পরিচয় করিয়ে দিলে আমি এমন চমকে উঠেছিলাম, আর এত অবাক হয়েছিলাম, যেন বিশ্বাস করতে পারি নি। আর এমন লজ্জা পেয়ে গেছলাম, আমি তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকাতেই পারছিলাম না। যত বড় মানুষই হোক, এরকম আমার হয় না। ধ্রুবপদ কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন।

'আমি যা ভেবেছিলাম, আমার কল্পনার সঙ্গে ওঁর চেহারা বয়স কিছুই মেলে নি। আমার কল্পনা থেকে তিনি দেখতে অনেক বেশি যুবা। আরো যদি বলতে হয়, তা হলে, তাঁর চেহারা কথাবার্তা সবই রীতিমতো রোমান্টিক।

'কথা প্রায় বলতেই পারলাম না। তবে মনে মনে একটা দুঃখ আর অভিমান হয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছি, আমার চিঠির কথা তাঁর মনে নেই। হয়তো অনেক নামের ভিড়ে আমি হারিয়ে গেছি! তবু, তাঁর চোখে মুগ্ধতা দেখে, আমার লজ্জা আর আবেগ যেন বেড়ে উঠল। আমি তাঁকে দাওয়াত করলাম, আমাদের বাড়িতে। জানি না আসবেন কী না। আমাকে আর সামাদ ভাইয়াকে তিনি চৌরঙ্গিতে কফি খাওয়ালেন। আমাকে আপনি করে বলাতে, আমি তুমি করে বলতে বলেছি। উনি বললেন সেই সময়ের অপেক্ষায় থাকলাম। সময় একটা বড় ফ্যাকটার তো। কথাটা অসম্ভব ভাল লাগল। সেই সময়ের অপেক্ষায় থাকলাম। তার মানে কি, যে সময়ে উনি আমাকে তুমি করে বলবেন?....'

২৩ মে

দুপুর

'আজ সকালে কে একজন এসেছিল, আনোয়ারের একটা চিঠি নিয়ে। আব্বাজানকে চিঠি দিয়ে গেছে, অনেক কথা বলে গেছে। আম্মা তাকে খাইয়ে দিয়েছে। চিঠিটা আমাকেও পড়তে দেওয়া হয়েছিল, পেন্সিল দিয়ে লেখা চিঠি, ভাল করে পড়া যায় না। লিখেছে, যশোর আর খুলনা, দু জায়গাতেই ওরা এখন গেরিলা কায়দায় লড়াই করছে। বেশির ভাগ সময় যশোর ক্যান্টনমেন্টের আশেপাশেই ওরা লড়ছে। খান সেনারা সব সময় আতঙ্কিত, দলে ভারী না হয়ে কেউ বেরোয় না। ইতিমধ্যেই ওরা সাতজন খান

সেনাকে মেরেছে। ওদের দলের ছুজন ধরা পড়েছে, একজন মারা গেছে।

'আনোয়ারের বোধহয় উপায় ছিল না, আমাকে আলাদা একটা চিঠি দেয়। তা না দিক, মাঝে মাঝে এরকম একটু খবর পেলেও স্বস্তি হয়। কিন্তু ভয় তাতে একটুও কাটে না। চিঠিটা বুকে চেপে, মুখে চেপে শুঁকে শুঁকে দেখলাম, মনে হল, আমি যেন আনোয়ারের গায়ের গন্ধই পাচ্ছি।'....

৭ জুন

রাত ১১টা

'ধ্রুবপদ আজ এসেছিলেন বিকালে। তাঁকে দেখে যে কেবল আমিই মুগ্ধ হয়েছি, তা না। আব্বা আম্মা, সকলেই মুগ্ধ। এমন কি জুবিদা ফুফাও। জুবিদা ফুফা এতকাল কলকাতায় আছেন, ধ্রুবপদ তাঁরও একজন প্রিয় কবি, অথচ কখনো আলাপ পরিচয় হয় নি। আমাকে আগেই বলে রেখেছিলেন, ধ্রুবপদ এলে যেন একটা খবর দিই।

'জুবিদা ফুফার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু তবু তাঁর স্বাস্থ্যের বাঁধুনি ভাল, চেহারাখানিও বেশ সুন্দর। ফুফা বেশ রসিকা মহিলা। তবে, আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেছল, উনি যেন ধ্রুবপদর সামনে একটু বাড়াবাড়ি করছিলেন। ধ্রুবপদ অবশ্য হেসে অমায়িক ব্যবহার করেছেন। আব্বা আম্মা তো ভীষণ খুশি। তাঁরা ছুজনেও ধ্রুবপদর কবিতা ভালবাসেন। মানুষ হিসাবেও ধ্রুবপদকে তাঁদের খুব ভাল লেগেছে। আব্বা তো ধ্রুবপদর গায়ে পিঠে হাত দিয়ে, রীতিমতো স্নেহ আর আদর করছিলেন, আর বারে বারে বলছিলেন, আপনি যে এরকম হ্যাণ্ডসাম ইয়ং ম্যান, তা ভাবি নি।

'ধ্রুবপদ লজ্জা পাচ্ছিলেন, আব্বাকে বলেছিলেন, তিনি যেন তাঁকে তুমি করে বলেন।

'আমার কথা আর কী বলব? এক কথায় তিনি যতক্ষণ ছিলেন, আমার যেন স্থান কাল পাত্র জ্ঞান ছিল না। অনেক নামকরা ব্যক্তির সঙ্গেই পরিচয় করা হয়েছে, কিন্তু এরকম কখনো হয় নি। ধ্রুবপদকে দেখে মনে হয়, তাঁর কীর্তির থেকে তিনি সুন্দর। এখন কবিতা থেকে, কবির প্রতিই যেন আমার আকর্ষণ বেশি! আমার এই লেখা কেউ কখনো দেখতে পাবে না, মনের কথা ভেঙেই বলি, তাঁর চেহারা, তাঁর কথা, সব যেন আমার রক্তস্রোতের ভিতর দিয়ে, মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্ধ হয়ে গেছে। কখনো কারোকে দেখেই আমার এরকম হয় নি। রবীন্দ্রনাথের সেই গান আমার মনে পড়ছে, মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না! উচিত না এরকম ভাবা। একটা সর্বনাশের মত লাগছে। কিন্তু কী করব, ধ্রুবপদ যে আমাকে একেবারে অসহায় করে দিয়েছেন। ধ্রুবপদ মানে একটা অবসেশন বলে মনে হচ্ছে। খোদা বাঁচাও।'....

২ জুলাই

রাত—?

'আজ নিয়ে আরো তিন দিন ধ্রুবপদ আমাদের বাড়ি এলেন। এখন আর আমার দাওয়াত না, আব্বার দাওয়াতে। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা একেবারে আলাদা। আজ হঠাৎ আনোয়ারও এসেছিল। আশ্চর্য! আজই হঠাৎ আনোয়ার এসে উপস্থিত। ধ্রুবপদ তখন এখানে। শুধু এখানে বললে ঠিক বলা হয় না। বসবার ঘরে তখন আব্বা আম্মা কেউ নেই। ধ্রুবপদ আর আমি কথা বলছিলাম। কথা? ওকে কি কথা বলা চলে? ধ্রুবপদর চোখে যেন নিশির ডাক, আর সেই ডাকের কাছে আমি সম্মোহিতা। সম্মোহনের স্পর্শ

কি ধ্রুবপদরও লাগে নি? মুগ্ধতার আবেশ কি তাঁর চোখেও নেই? আমি কবি নই, তাঁর মত আমার ব্যক্তিত্ব নেই। কিন্তু আমার কি কিছুই নেই? না থাকলে, তাঁর চোখে কিসের আলো? কী বলছিলেন তিনি তখন? কবি হিসাবে তাঁর যেমন একটা বিষণ্ণ দিক আছে—যাকে বলা যায় মেলাংকোলিয়াস্, তেমনি আছে এক তীব্রতা, বাণীর ভিতর দিয়ে যা আকাঙ্ক্ষা ও আশ্লেষের সৃষ্টি করে। সেই ভাষাতেই তিনি আমাকে কিছু বলছিলেন, আমার সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আর মনোভাবের কথা। আমি সব শুনছিলাম না, আমার বুকের মধ্যে কাঁপছিল। যেন তিলে তিলে আমার মৃত্যু হচ্ছিল. অন্তর থেকে আমি তখন তাঁর কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিতা।

সে সময়েই হঠাৎ পর্দার বাইরে, খোলা দরজার গায়ে ঠুক ঠুক শব্দ হয়েছিল। আমি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কে? দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতেই, যেন এক ঝলক বারুদের গন্ধ নিয়ে আনোয়ার ঢুকেছিল।

'আনোয়ার ঢুকেছিল, চোখের আলোয় হাসি ফুটিয়ে, কিন্তু আমার দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র যেন ওর চোখের আলোয় ছায়া নেমে এসেছিল। জানি না, আমার চোখে-মুখে কী দেখেছিল, ওর চোখের ছায়ায় যেন একটা ব্যথিত চকিত জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছিল, তারপরেই তাকিয়েছিল ধ্রুবপদর দিকে। আনোয়ারের দাড়ি গোঁফ আরো বড় হয়েছে। ছেঁড়া আলখাল্লার মতো জামার কোমরে চওড়া বেল্টের গায়ে রিভলবারটা না থাকলে ওকে একজন সাধক গাজী বলে মনে করা যেত। সেই তুলনায়, আমার গায়ে ছিল রঙ মেলানো উজ্জ্বল সিল্কের শাড়ি জামা, ঠোঁটে রঙ, চোখে কাজল, পরিপাটি মস্ত খোঁপায় বেলকুঁড়ির মালা জড়ানো।

'আমি যে অন্তরে একটা কষাঘাত বোধ করি নি, তা না, কিন্তু সেটা বুঝতে না দিয়ে বলেছিলাম, তুমি! বস। আব্বা আম্মাকে খবর দিই।

'হঠাৎ আমি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। ভিতরে যেতে গিয়েও, আবার তাড়াতাড়ি ফিরে ধ্রুবপদকে দেখিয়ে বলেছিলাম, উনি ধ্রুবপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি, তুমি তো জান ওনার নাম। আর ধ্রুবপদকে বলেছিলাম, আনোয়ার। এর বেশি কিছু বলতে পারি নি, বাড়ির ভিতরে যেতে যেতে দেখেছিলাম, ধ্রুবপদ দাঁড়িয়ে উঠে, আনোয়ারের দিকে তাঁর একটি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

'তারপরে যা হয়, আব্বা আম্মা ছুটে এসেছিলেন। আনোয়ারকে পেয়ে তাঁরা ধ্রুবপদকে ভুলেই গিয়েছিলেন। দুজনে এত কথা আনোয়ারকে এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করছিলেন, আনোয়ারের পক্ষে সব জবাব দেওয়াই মুশকিল হচ্ছিল। তবে আব্বা অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তি, একটু পরেই ধ্রুবপদকে বলেছিলেন, কিছু মনে করো না, আনোয়ার আমাদের বড় স্নেহের আপনজন, আমার ছেলে নেই, ও-ই আমার ছেলে। ও আছে এখন ওয়ার ফিল্ড-এ।

'ধ্রুবপদ বলেছিলেন, ইতিমধ্যে দু এক কথাতেই, তিনি আনোয়ারের পরিচয় পেয়ে গিয়েছেন, এবং বর্তমানে বাঙলাদেশের যুদ্ধে তিনি শারীরিকভাবে শামিল না হলেও, অন্যভাবে শামিল আছেন। আনোয়ারের প্রতি তাঁর দৃষ্টি দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তিনি মুগ্ধ ও খুশি। কিন্তু আনোয়ার তাঁর দিকে বেশি তাকায় নি। তাঁর কথার জবাবও দিচ্ছিল সংক্ষিপ্ত, খাপছাড়া ভাবে। তারপরে আনোয়ার জানিয়েছিল, বিশেষ দরকারে ওকে ইণ্ডিয়া বর্ডারে আসতে হয়েছিল, কলকাতায় ওর আসবার কথা না। দেরি করবার উপায় নেই, ওকে তখনই ফিরতে হবে। আব্বা আম্মা আবার খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আনোয়ার দেরি করে নি, মাত্র এক পেয়ালা চা খেয়েই বিদায় নিয়েছিল। যাবার আগে সে ধ্রুবপদর সঙ্গে করমর্দন করেছিল, আমার দিকে পলকের জন্য একবার তাকিয়ে, শুধু বলেছিল, চলি।

'আম্মা বলেছিলেন, আনোয়ারকে একটু মনমরা মনে হল।

আব্বা বলেছিলেন, মনমরা না, চিন্তা, কত বড় দায়িত্ব মাথায়, চিন্তা হবে না? কিন্তু তারপর আর আমাদের গল্প আড্ডা ভাল জমে নি। ধ্রুবপদও একটু পরে বিদায় নিয়েছিলেন। আমি কিন্তু ওঁর চোখের দিকেই তাকিয়েছিলাম। অথচ আনোয়ারের কথাও ভুলতে পারছিলাম না।

'এখন ভাবছি, আনোয়ার কী ভেবে গেল?'...

রোজনামচাটির দৈনন্দিন ঘটনা আমি প্রকাশ করিনি, এর পরবর্তী প্রাত্যহিক ঘটনার ডিটেল তুলে দেবারও কোনো দরকার নেই। ক্রমে ক্রমে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, ধ্রুবপদর সঙ্গে আয়েশার সম্পর্ক বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতো এগিয়ে চলেছে, এবং দু'জনের আবেগই একই উচ্চতার পাশাপাশি। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি ঘটনার বিবরণে একটি স্পষ্ট সংকেত পাওয়া যায়। ধ্রুবপদ আয়েশার ভবিষ্যৎ প্রায় নির্বাচিত, যার পরিণতি পরস্পরকে ছেড়ে থাকা সম্ভব না। ছোটখাটো কয়েকটি ঘটনায় জানা যাচ্ছে, জুবিদা ফুফা, যাঁর বিষয়ে আয়েশা একটু বিরক্তই ছিল, তিনিই শেষপর্যন্ত আয়েশাকে গোপনে সাহায্য করতে চেয়েছেন, অর্থাৎ তিনি সমর্থন করেন। বিপরীত সামাদ ভাইয়া। তিনি ধ্রুবপদর ওপর যতো না বিরূপ, তার থেকে অনেক বেশি বিরক্ত আয়েশার ওপর। বর্তমান অবস্থায় আয়েশার এই প্রেম ও হৃদয়াবেগ তিনি ভাল চোখে দেখেন নি। প্রথমত আনোয়ার একজন দেশপ্রেমিক যোদ্ধা, এবং বর্তমানে সে যুদ্ধে লিপ্ত। এটা একটা চরম অবিচার। দ্বিতীয়ত ধ্রুবপদ বিবাহিত, ধর্মের প্রশ্ন অনিবার্যভাবে উঠবে, এবং কলকাতায় ধ্রুবপদকে নিয়ে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হবে।

আয়েশা যে সে কথা বোঝে না, তা না! ১০ নভেম্বর তারিখে আয়েশা লিখেছে:

'আমি তো জেনে শুনে বিষ পান করি নি, যদি এটা বিষ পান হয়। তবে এই বিষের মধ্যেও অমৃতের স্বাদ কেন? ধ্রুবপদ যে আমার সমস্তটা জুড়ে বসবেন, আমি জানতাম না, এ আমার নিজের ইচ্ছায় হয় নি। খোদাতাল্লাহ্ জানেন, আমি আগে থেকে ভেবে—চিন্তা করে কিছু করি নি। পতঙ্গ যেমন জানে না, আগুনে তার মরণ, আমিও জানতাম না। আমি পতঙ্গের মতোই তাঁর দিকে ছুটে গিয়েছি। এখন আমার ডানা পাখনা সবই পুড়ে গেছে, আমার আর কোথাও নড়বার ক্ষমতা নেই। কিন্তু কী ভাবে কী হবে কিছুই বুঝতে পারি না। আব্বাজান জানলে কী বলবেন, খোদা জানেন। আমার ভাবতেই ভয় লাগে। আর আনোয়ার? জানি না সে কী ভাববে। সে যদি এ-জীবনে আর আমার মুখ না দেখতে চায়, দেখাব না। ধ্রুবপদই বা কী করবেন, বুঝি না। তিনি যে খুব বিচলিত, চিন্তিত, বুঝতে পারি। আমি সকলের দুঃখের কারণ হয়ে উঠেছি....।'

তারপরেই ১৩ নভেম্বরে আবার একই ঘটনার বিস্ময়কর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সেই তারিখে আয়েশা রাত্রে লিখেছে :

'এ কি খোদারই খেয়াল! আজও হঠাৎ সন্ধ্যাকালের অন্ধকারে আনোয়ার এসে হাজির। ধ্রুবপদ আব্বার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমিও একটা চেয়ারে বসেছিলাম। আজ আনোয়ারের সঙ্গে একজন ইণ্ডিয়ান মিলিটারির জোয়ান ছেলে ছিল। আব্বাজান তো লাফিয়ে উঠে আনোয়ারকে জড়িয়ে ধরলেন। ধ্রুবপদ আনোয়ারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আনোয়ারের মুখে হাসি ছিল না, কোনোরকমে ধ্রুবপদর হাতটা স্পর্শ করেছিল। ধ্রুবপদ তারপরে ইণ্ডিয়ান অফিসারের দিকেও হাত বাড়িয়ে করমর্দন করেছিলেন। আম্মা ছুটে এসেছিলেন। অনেক কথার মধ্যে, আনোয়ার কেবল একটি কথা বললো, খানেরা এখন কুকুরের মত পালাবার চেষ্টা করছে। লড়াইয়ে আমাদের জিত হবেই, আর বেশি

দেরি নেই। আব্বার চোখ ফেটে প্রায় জল এসে পড়েছিল। বলেছিলেন, তাই হোক, তাই হোক, দেশে যাবার জন্য মন বড় পাগল হয়েছে।

'তারপর আরো কিছু কথার পরেই, আনোয়ার বিদায় নিল, ইণ্ডিয়ান মিলিটারিকে নিয়ে। তার দেরি করবার উপায় ছিল না। আনোয়ার আজ আমাকে কিছুই বলে নি। এতে আমার কিছু মনে না হবারই কথা, কিন্তু বুকের মধ্যে একটা ভারি কষ্ট টনটনিয়ে উঠছিল।'....

ডিসেম্বরের গোড়া থেকেই, রোজনামচার যা সব থেকে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক, তা হলো ধ্রুবপদর অনুপস্থিতি। আয়েশার উদ্বেগ ব্যাকুলতা আর বিভ্রান্তি। রোজনামচা পড়ে মনে হয়, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকেই ধ্রুবপদ অধ্যাপক সাহেবের বাড়ি আর আসে নি। জুবিদা ফুফার বাড়িতে টেলিফোন আছে। সেখান থেকে আয়েশা অনেকবার ধ্রুবপদকে টেলিফোন করেছে। কখনোই যোগাযোগ হয় নি। আয়েশা ধ্রুবপদর ঠিকানায় চিঠি দিয়েছে। কোনো জবাব আসে নি।

আয়েশার এই উদ্বেগ ব্যাকুলতার মধ্যেই যশোর ক্যান্টনমেণ্টের পতন ঘটে। ভারতীয় ফৌজ আর মুক্তিবাহিনী দুর্বার গতিতে চারদিক থেকে ঘিরে, ঢাকার দিকে এগিয়ে চলতে থাকে। সেই সময়ে আয়েশা ধ্রুবপদর একটি চিঠি পায়। কয়েক ছত্রে শুধু এই লেখা ছিল, 'আমি বাঙলাদেশে যাচ্ছি। হয়তো তোমার সঙ্গে আমার সেখানেই দেখা হবে। আমার আচরণের জন্য মার্জনা চাই।'...

পরবর্তী লেখায় দেখা যায়, আয়েশার মনে নানান জিজ্ঞাসা, ধ্রুবপদকে ঘিরে কিছু স্মৃতিমন্থন, দুঃখ, কষ্ট, রাগ এবং এমন কি নিজেকে কখনো কখনো অপমানিতও বোধ করেছে।

অতঃপর মাঝখানের কিছু ছেড়ে গেলে, রোজনামচায়, ঢাকার

কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যুদ্ধ জয়ের উৎসব, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও প্রত্যাবর্তন, অধ্যাপক হাবীব সাহেবের উল্লাস ও আনন্দ এবং সেই সঙ্গে আয়েশার নিজের মনের কথা। তার একটি কথাতেই অনেকখানি বোঝা যায়, 'আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, কোথা থেকে কোথায়ই বা গেছলাম। কী ছিল, কী গেল, কী পেলাম, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। মাথাটা চিন্তাশূন্য। অথচ সারা দেশে জয়ের উৎসব চলছে।'

তারপরে সমস্ত জানুয়ারি মাসে রোজনামচার একটি অক্ষরও লেখা হয় নি। ফেব্রুয়ারির ৭ তারিখে লেখা :

'আনোয়ারের জন্য সবাই চিন্তিত। তার কোনো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। সে যে বাহিনীতে ছিল, তাদের কেউ কেউ বলেছে, পাঁচ জনের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, তার মধ্যে আনোয়ারও আছে। আনোয়ারের আব্বা, আমার আব্বা, সকলে দেশের চারদিকে পাগলের মত খোঁজাখুঁজি করছেন, কোথাও কোনো সন্ধান মিলছে না। আনোয়ারের কথা ভাবলে আমি যেন কেমন চমকে উঠি। ভয়ে খোদাতাল্লাহ্‌কে ডাকি, বলি, আমার জন্য না, আনোয়ারকে তুমি বাঁচিয়ে রাখ।'....

বোঝা যায়, আয়েশা নিজেকে আনোয়ারের জন্য অপরাধী ভাবছে। তারপরে ১২ ফেব্রুয়ারিতে জানা যায়, ধ্রুবপদ ঢাকায়, আয়েশাদের সঙ্গে দেখা করেছে, এবং তার কাছ থেকেই সংবাদ পাওয়া যায়, সম্ভবত আনোয়ার ভারতের কোনো সামরিক হাসপাতালে আহত অবস্থায় আছে। এ কথা শোনার পরেই অধ্যাপক হাবীব সাহেব ধ্রুবপদকে আর ছাড়েন নি। বলেন, 'তোমার সঙ্গে আমি যাব, তোমাকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে, আমার আনোয়ারকে খুঁজে দিতে হবে।'

ধ্রুবপদ ঢাকার পতনের আগেই বাংলাদেশে এসেছিল। সে হাবীব সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হয়। আয়েশার রোজনামচায় লেখা

ছিল, 'তাঁকে ক্লান্ত আর শান্ত মনে হল, কিন্তু আশ্চর্য, আমার দিকে যখন চোখ তুলে তাকালেন, আমি রাগ করতে পারলাম না। তিনি খুব সহজেই, স্নেহের স্বরে আমার সঙ্গে কথা বললেন। তবু আমার কান্না পাচ্ছিল।'....

এর পরেই রোজনামচার ভাষা বদলে গিয়েছে। অত্যন্ত উদ্বেগ ব্যাকুলতা নিয়ে তিনজন ভারতবর্ষে আনোয়ারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অধ্যাপক হাবীব সাহেব, আয়েশা আর ধ্রুবপদ। রোজনামচার ভাষায়ঃ 'কবি ধ্রুবপদ যেন আমাদের পরিবারেরই একজন। আনোয়ারের জন্য যে তাঁর এত উদ্বেগ আর মমতা আছে, বুঝতে পারি নি!'....কিন্তু আনোয়ারের সন্ধান মেলার আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। পশ্চিমবঙ্গের কোনো সামরিক হাসপাতালেই তার সন্ধান মিললো না।

ধ্রুবপদ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে খোঁজখবর নিল। ফোর্ট উইলিয়ম থেকে মোটামুটি একটা তালিকা পাওয়া গেল, বাংলাদেশের বাঙালী যোদ্ধারা কে কোন হাসপাতালে আহত হয়ে আছে। তার মধ্যে, খান আনোয়ারের নাম কোথাও পাওয়া গেল না। একটাই মাত্র আশা—অতি ক্ষীণ আশা, কিছু কিছু আহতের নাম নেই, কেবল বাঙালী বলে উল্লেখ করা আছে। সেই বেনামীদের মধ্যে যদি আনোয়ার থেকে থাকে। তাছাড়া, কিছু আহত ভারতের বাইরে অন্যান্য মিত্র রাষ্ট্রেও চিকিৎসিত হতে চলে গিয়েছে। ফেব্রুয়ারির ২৬ তারিখে লেখা আছেঃ

'...আব্বা বললেন, ভারতের বাইরে যেতে না পারি, ভারতের সব হাসপাতালগুলি আমি খুঁজে খুঁজে দেখব। আমারও তা-ই ইচ্ছা। কিন্তু আমি আর বাবা কি অচেনা দেশে আনোয়ারকে খুঁজে বেড়াতে পারব। ধ্রুবপদ যদি না যেতে চান?

'ধ্রুবপদকে আমি কতটুকু চিনি। আজ সকালেই তিনি নিজে এসে বলেছেন, তিনি আমাদের সঙ্গে যাবেন, আনোয়ারকে খুঁজবেন।

তারপর আমাকে বললেন, দুশ্চিন্তায় শরীরটাকে নষ্ট করছো কেন? তুমি হলে বেহুলা, আনোয়ারকে খুঁজে পাবেই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

'তার কথা শুনে আমার চোখে পানি এসে গেল, আর কেমন একটা সুখ, অথচ ব্যথার মত বাজল। আনোয়ারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের বিষয়ে তিনি আগে আর কখনো এরকম বলেন নি। তিনি জানেন বলেই আমাকে বেহুলার সঙ্গে তুলনা করলেন। আল্লা, এর থেকে আমার বড় সম্মান আর কী আছে? কিন্তু সেই সম্মান কি আমি রাখতে পারব? খোদা, আমার মান রেখ।'

এরপর রোজনামচায় ভারতের নানান জায়গায় সামরিক হাসপাতালে ঘোরা, আর উৎকণ্ঠিত হতাশা। তার সঙ্গে শারীরিক ক্লান্তি, অর্থব্যয়ের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ধ্রুবপদর কষ্টের কথাও বলা হয়েছে।

হতাশার চরম সীমায়, আনোয়ারের সন্ধান মিললো, রাঁচির সামরিক হাসপাতালে, ফেব্রুয়ারির ২৬ তারিখে। শারীরিক আঘাতের থেকেও, আনোয়ারের স্মৃতিশক্তি কিছুটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ধ্রুবপদ রাঁচি থেকেই বিদায় নিয়েছিল। রোজনামচায় তারপর ১২ মার্চ ঢাকায় লেখা হয়েছে:

'....উনি রাঁচি থেকেই বিদায় নিয়েছিলেন, আর তাঁর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয় নি। আমার মন বলছে, আর বোধহয় কখনো হবে না। হলে বড় ভাল হয়। আনোয়ারের স্মৃতিশক্তি আবার ফিরে আসছে। সে ধ্রুবপদর সঙ্গে দেখা করতে চায়, কথা বলতে চায়। বলেছে, কলকাতায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে।

'তিনি আমাকে বেহুলা বলেছিলেন। মিথ্যা বলেন নি। আনোয়ারের সঙ্গে আমার শাদী আসন্ন। সেটা আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু এক এক সময় বড় আনমনা হয়ে যাই, অকারণ চমকাই, মনটা ভার হয়ে যায়। মনে মনে বলি, খোদা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার সৌভাগ্যকে মহৎ কর!'....

নায়িকা

মেয়েটির মধ্যে নায়িকা-লক্ষণ ঠিক কী ছিল, আমি জানি না। সঠিক নায়িকা-লক্ষণই বা কাকে বলে, সে বিষয়েও আমার সম্যক কোন ধারণা নেই। অবিশ্যি শাস্ত্রীয় মতে যাকে নায়িকা-লক্ষণযুক্তা বলা হয়ে থাকে। তার বিষয়ে একটা কেতাবী ধারণা আছে। না, ভুল হল। নায়িকা-লক্ষণ বলে বিচার করা হয় নি। বিভিন্ন শ্রেণীর নারীর রূপ দেখে, নানা শ্রেণীতে তাদের ভাগ করা হয়েছে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে যেরকম শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছে, আমি ঠিক তার কথা বলছি না। হিন্দুশাস্ত্রমতে নারীর বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে শরীরের বর্ণ, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং কেশ ইত্যাদি থেকে নানান বিশেষণে নারীদের ভূষিত করা হয়েছে। তার মধ্যে সতী-অসতীর বিচারও আছে।

নায়িকা-লক্ষণ বললে বোধহয় অন্য কিছু বোঝায়। সতী-অসতীর বিচার এক কথা। নায়িকা-বিচার বোধহয় আর এক কথা। এসব কোনটাই আমার নিজের কথা, নিজের বিশ্বাসের কথা না। নিতান্ত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার কথা বলছি। হিন্দুমতে, সর্বগুণ সুলক্ষণা, স্নেহশীলা, প্রেমব্যাকুলা কান্তা বা দয়িতা, সুলক্ষণার মধ্যেও সামান্য কয়েকটি রেখা ও রোমরাজির জন্যই যে-নারী গৃহাঙ্গন ও বহিরাঙ্গনের মধ্যপথে বিচরণশীলা, কিংবা সুবর্ণচ্ছটা ও সুদেহিনী নারীর বস্তিদেশ থেকে উদ্‌গত কেশরেখা নাভিস্থলগামী, একমাত্র

এই কারণেই সে সুভোগা গণিকা-লক্ষণা—ইত্যাদির বিচার একরকম। নায়িকা-লক্ষণের কথা উঠলেই, চিন্তা ধাবিত হয় তন্ত্র ও শাক্ত ধারার দিকে! সেখানে তো নটী, ডোম্বিনী, বেশ্যা, যবনী, শূদ্রাণী, ব্রাহ্মণী অনেকেই নায়িকা।

নায়িকা তো, সম্ভবত হিন্দুশাস্ত্রমতে, প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যাও। অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী স্তথা। যাঁরা সকলেই একাধিক পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়েছিলেন। কিন্তু সেইজন্যই তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়া নন, আরো গভীরতর কারণ ও ব্যাখ্যা আছে।

আমি আসলে সিনেমার হিরোইনের কথা বলতে যাচ্ছিলাম। এত কথার পরে এ কথাটা, একটু অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স মনে হতে পারে। না, আমি কোন প্রতিষ্ঠিত মুভি হিরোইনের কথা বলছি না। আমার স্বল্প-পরিচিতা এক মহিলা, এখন থেকে বছর চারেক আগে তাঁর কন্যাকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য, কন্যাটিকে তিনি চিত্রজগতের একটি তারকা করতে চান, সে জন্য আমার সাহায্য চাই। চলতি কথায় আমরা যাকে 'ফিল্মে নামা' বলি, তা-ই। এই 'নামা' কথাটাকে অবিশ্যিই 'অবতীর্ণ' অর্থে ধরতে হবে।

আমার কাছে কেন?

কারণ আছে। আমার দু'চারটি গল্প অবলম্বনে ছবি হয়েছে। তা থেকেই অনেকে, সেই মহিলার মতই, ধরে নেন, চিত্রজগতের চিচিংফাঁক মন্ত্রটা আমার জানা আছে। তার আগে, চিত্রজগতে, আমার অস্তিত্বের স্বরূপ তো তাঁরা জানেনই না, এমন কি যার জন্য ওকালতি করেন, তার রূপ স্বাস্থ্যের দিকেও বোধহয় একবারটি ভালো করে তাকিয়ে দেখেন না। অবিশ্যি এ কথাটা বলা হয়তো ঠিক হল না। তারকা, তা মহিলা বা পুরুষ যে-ই হোক, সকলের কাছে একরকম অনিন্দনীয় সুন্দর না। অতএব, রূপের বিচারে আমার না যাওয়াই ভালো। সত্যিই তো, কোন্ মেয়ে বা ছেলেকে যে কোন্ ভূমিকায় কাজে লেগে যায়, তা কে বলতে পারে।

আমরা যখন লিখি, আমাদের নারী-চরিত্র মাত্রেই রূপবতী এবং স্বাস্থ্যবতী হয় না। পুরুষরাও না কন্দর্পকান্তি। তবু ওই মন্দের ভালো বলে একটা কথা আছে তো। দশ জনের পাতে দেবার একটা ব্যাপার আছে। সেই ভেবেই কথাটা বললাম। কিন্তু তাতে কী যায় আসে। আসলে এ ব্যাপারে, সাহায্যকারী হিসাবে, একেবারেই অক্ষম।

ভদ্রমহিলার অবস্থার কথা যত দূর জানি, ভালো না। আর্থিক অবস্থার কথা বলছি। ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের নিচে। স্বামী কোথাও চাকরি করতেন, কী এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের বয়স কুড়ি-একুশ। ছোটখাটো একটি কারখানায় কাজ শিখছে। বেতন সামান্য। তারপরেই এই কন্যা। আঠারো-উনিশ বছর বয়স। আরো দুটি আছে, সে দুটিও কন্যা। ভদ্রমহিলা নিজেও সামান্য বেতনের একটি চাকরি করেন। নিতান্তই সামান্য এক বালিকা বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান বলা যায়।

ভদ্রমহিলার উদ্দেশ্য জানবার পরে তাঁর কন্যার দিকে ভালো করে তাকিয়ে, কেন যেন মনে হল, এ মুখ আমার চেনা। কোথায় দেখেছি, মনে করতে পারি না। হয়তো, আশেপাশে পথে-ঘাটেই দেখেছি। মেয়েটি দেখতে মোটামুটি সুশ্রীই। স্বাস্থ্য তেমন উজ্জ্বল না, খারাপও না, একহারা, গঠনও দীর্ঘই। অ্যাভারেজ বাঙালী মেয়েদেরই চোখ একটু বড় হয় বলে আমার ধারণা এবং এরও তা-ই। মেয়েটি সলজ্জ হেসে আমার দিকে তাকাল। আবার মুখ নামিয়ে নিল।

আমি হেসে ভদ্রমহিলাকে বললাম, 'কিন্তু ফিল্মের ব্যাপারে আমি তো কিছু করতে পারব না।'

উনি আমার উক্তিকে বিনয় মনে করে বললেন, 'তা-ই আবার কখনো হয় নাকি। আপনার এত গল্প সিনেমা হচ্ছে, সিনেমার কত লোকের সঙ্গে আপনার জানা-শোনা, আপনি ইচ্ছা করলেই নামিয়ে দিতে পারেন।'

অবাক হবার কিছু নেই, এরকম কথা অনেকবার শুনেছি। কথা ফেরাবার জন্যই মেয়েটিকে একবার দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'ও পড়াশোনা করে না?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'ইস্কুল ফাইনাল পাস করেছে।'

বললাম, 'কলেজে দিচ্ছেন না কেন?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'কলেজে পড়াবার টাকা কোথায় পাই বলুন?'

সহজেই বললাম, 'তা হলে বিয়ে দিয়ে দিন।'

ভদ্রমহিলা যেন আমাকে করুণা করেই হেসে বললেন, 'বিয়ে দেবার মত টাকা যদি থাকত, তা হলে তো কলেজেই পড়াতাম।'

অকাট্য যুক্তি। আমারই ভুল। সত্যিই, বিয়েই যদি দিতে পারবেন, তাহলে তো কলেজেই পড়াতেন। সমস্যা তো সে-ই একটাই, টাকা। আর টাকা না হলে বিয়ে? অধিকাংশ মধ্যবিত্তের মানসিকতাই সকলের জানা আছে। সকলেই জানে, মধ্যবিত্তের জীবনের বাস্তবতা, আর তার আদর্শ সংস্কৃতি অনেকটাই ঘোড়া আর গাধার মিশ্রিত এক সংকরবর্ণের পশুর দ্বারাই চিহ্নিত। মনে আর মুখে, ভিতরে আর বাইরে, দুস্তর অমিলের এমন নজীরটি আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

তা না হয় হল, কিন্তু কন্যাকে 'সিনেমাতেই নামাতে' হবে কেন?

ভদ্রমহিলা বললেন, 'নিজের মেয়ে বলে বলছি না, অভিনয়ে ওর বেশ ন্যাক্ আছে।'

'ন্যাক্' একটি শব্দ, ইচ্ছা করে শিব্রাম চক্রবর্তীর কাছে পাঠিয়ে দিই। ন্যাক্ থেকে পান্ করে কী শব্দ বের করা যায়, তিনিই ভালো বলতে পারবেন। আজকাল কথাটার প্রচলনও সর্বত্র। ভদ্রমহিলা আরো বললেন, 'কয়েকটা নাটকে অভিনয়ও করেছে, সবাই ভালো বলেছে। তাছাড়া, নাচ-গানও ভালো জানে।'

আমি মেয়েটির সলজ্জ হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তাই নাকি? কোথায়, কার কাছে শিখেছে?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমাদের ওদিকেই, একটা নাচ-গানের ইস্কুলে।'

সেখানে কারা নাচ-গান শেখান, ভদ্রমহিলা তাও বললেন। শুনে আমার মনে হল, যে রকম শিক্ষালয়ের কথা তিনি বলছেন, সেখানে নিশ্চয়ই টাকা দিতে হয়। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করতে আমার বাধল। উনি নিজেই তার একটা ব্যাখ্যা আমাকে শুনিয়ে দিলেন, 'আসলে মেয়ের যেদিকে ঝোঁক আমি ওকে সেদিক দিয়েই শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে চাই। লেখাপড়া শিখলেও আজকাল যা বাজার কোন ভরসা নেই। এদিক দিয়ে যদি উঠতে পারে, সেটাই দেখি।'

এরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা ভালো। কিন্তু ভরসা খুব কি আছে? তা ছাড়া, আজ যাঁরা নাম-করা চিত্রতারকা, তাঁদের চিত্রাবতরণের ব্যাকগ্রাউণ্ড আমার ঠিক জানা নেই। মাঝে মাঝে নানান গল্প-টল্প শুনি। আমি বললাম, 'কিন্তু দেখুন, সত্যি এ বিষয়ে আমার কিছু করার নেই। পরিচয় হয়তো কারো কারো সঙ্গে আছে, তাঁদের জগতে নাক গলাবার মত ঘনিষ্ঠতা নেই।'

ভদ্রমহিলা ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তা বললে শুনছি না। আপনার এত গল্প ছবি হচ্ছে, আপনি বললে নিশ্চয়ই নেবে।'

আমি তাঁকে কিছু বলবার আগেই শর্মিষ্ঠা (মেয়েটার নাম) বলে উঠল, 'আপনি আমাকে একবার চান্স করে দিয়ে দেখুন, আমি ঠিক পারব!'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমার মেয়ের এটা একটা ছেলেবেলার স্বপ্ন। আপনাকে সাহায্য করতেই হবে।'

কী বলি। কী বলেই বা বোঝাই। আমার অসহায়তার কথাই আরো স্পষ্ট করে বললাম, 'দেখুন, ও জগৎটা একেবারে আলাদা।

ওঁদের যখন মেয়ে বা ছেলে দরকার, ওঁরা নিজেই যোগাড় করে নেন।'

শর্মিষ্ঠা বলে উঠল, 'তা ঠিক। কিন্তু সব সময় তো তাঁরা দরকার মত খুঁজে পান না। হয়তো আমাকে দেখলে তাঁদের মনে হতে পারে, আমাকে দিয়ে হবে। আপনি কেবল একবারের মত চান্স করে দিন।'

আরো কিছু যুক্তি-তর্ক বিনিময় করে বুঝলাম, মা-মেয়ের সঙ্গে আমি পারব না। এর আগেও অনেকের সঙ্গে পারি নি। অথচ সত্যি সত্যি কোন পরিচালক বন্ধু যখন কোন ছেলে বা মেয়ের জন্য ক্রাইসিসে পড়ে, তখন পছন্দ-মত ছেলে-মেয়ে চোখে পড়ে না। অগত্যা, শর্মিষ্ঠার জন্য আমি আমার এক ঘনিষ্ঠ চিত্র-পরিচালক বন্ধুকে একটি চিঠি লিখে দিলাম, 'পত্রবাহিকা ছবিতে অভিনয় করতে চায়। আপনার কোন ছবিতে যদি একে সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়, একটু বিবেচনা করে দেখবেন,'....ইত্যাদি।

অবিশ্যি একটিমাত্র চিঠিতে ভদ্রমহিলা খুশি হন নি। এক পরি-পরিচালক না নিলে, আবার অন্য পরিচালকের জন্য তিনি আসবেন, সে কথা শুনিয়ে গেলেন। যাই হোক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর পরিণতি কী হয়, আমার কিছু কিছু জানা আছে। সে বিষয়ে আমি বিশদ বলতে চাই না। শর্মিষ্ঠা যদি চিত্রতারকা হতে পারে, আমি খুশিই হব। না হতে পারলে, সে যেন সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে, এটাই প্রার্থনা।

তারপরে শর্মিষ্ঠার কথা আমার মনে থাকার কথা না। ছিলও না। কিন্তু যে কারণে আমার মনে হয়েছিল, শর্মিষ্ঠার মুখ যেন আমার চেনা-চেনা, সেই কারণটা জানা গিয়েছিল। যত দিন শর্মিষ্ঠা আমার কাছে আসে নি, ওর কোন পরিচয় আমার কাছে ছিল না, তত দিন ও আমার আশে-পাশে আর দশটা মেয়ের মত ঘোরাফেরা করেছে, বিশেষভাবে চোখে পড়ার কারণ ছিল না। আমার সঙ্গে

দেখা করলুম কিছু দিনের মধ্যেই শর্মিষ্ঠাকে [illegible] নানান জায়গায় নানান ধরনের লোকের সঙ্গে দেখতে পেয়েছি। যাদের সঙ্গে দেখতে পেয়েছি, ওরা যে সবই ওর আত্মীয় ব্যক্তি, তা আমার মনে হয় নি। না হওয়ার কারণও ছিল। ওর সঙ্গে [illegible] এমন দু-একজনকে দেখেছি, যাদের আমিও একটু-আধটু চিনি। [illegible] একজন মধ্য-বয়স্ক উকীল ভদ্রলোকের সঙ্গে ওকে আমি [illegible] দেখেছি। একটু অবাক হয়েছি, মনে প্রশ্ন জেগেছে, আবার আপনা থেকেই তা মিলিয়ে গিয়েছে। কারণ আর কিছুই না, সেই আইনজীবী ভদ্র-লোকের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা বা যোগাযোগের [illegible] কিছুই অনুমান করতে পারি নি। সেইজন্য বিস্মিত জিজ্ঞাসা [illegible]

শর্মিষ্ঠাকে যখন যুবক বয়সের কারোর সঙ্গে দেখছি, তখন তেমন অবাক হই না। অনেকটা স্বাভাবিক বলেই মেনে নিই। তবু তার মধ্যে একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে যায়। ও যাদের সঙ্গে, যে-সব জায়গায় ঘোরে, গোটা চেহারাটার সঙ্গে ওর পারিপার্শ্বিকের অবস্থাকে মেশানো যায় না। যেমন, অভিজাত রেস্তোরাঁয় বা বিভিন্ন ক্লাবে ওকে আমি দেখেছি, তাদের সবাইকে চিনি না, কিন্তু তারা যে অবস্থাপন্ন, সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কেন না, শর্মিষ্ঠাদের অবস্থার লোকদের সেখানে যাবার সঙ্গতি নেই। আমি জানি না শর্মিষ্ঠা আমাকে কখনো দেখেছে কী না। দেখে থাকলেও, জানতে দিতে চায় নি। আমিও কখনো আমার উপস্থিতিকে জানাবার বা দেখা-বার কোন চেষ্টা করি নি। বরং ওকে দেখে অস্বস্তি বোধ করেছি, পাছে ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায় সেই লজ্জাতেই মুখ ঘুরিয়ে রেখেছি। অথচ শর্মিষ্ঠাকে মনে হয়েছে বেশ স্বাভাবিক, সাবলীলা। এমন কি, খিলখিল হাসিতে ওর সর্বাঙ্গ হিল্লোলিত হতে দেখেছি।

আমার বাড়িতে যে শর্মিষ্ঠাকে দেখেছিলাম, বাইরের শর্মিষ্ঠা তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হাস্যোলাস্যে কৌতুকে কটাক্ষে, বেশবাসে, চলনে কথনে, এ শর্মিষ্ঠা অন্য এক মেয়ে, যাকে নায়িকাই বলতে

ইচ্ছা করে। বালিকা বিদ্যালয়ের হতদরিদ্র সেই লাইব্রেরিয়ান ভদ্রমহিলার মেয়ে বলে মোটেই মনে হয় না।

আমার বাড়িতে শর্মিষ্ঠাকে দেখার পরে বছর দুয়েক কেটে গিয়েছে। স্বস্তির সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে ও বা ওর মা আর কখনো আমার কাছে আসে নি। ইতিমধ্যে শর্মিষ্ঠার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে, এবং বলতে হয়, ও দেখতেও আগের থেকে সুন্দর হয়েছে। কিন্তু এই সব ছবি থেকে সাধারণত আমরা একটা সিদ্ধান্তেই আসতে পারি, এবং সেই সিদ্ধান্তের কথা ব্যাখ্যা করে বলারও দরকার নেই

আপাতত এই চিত্রের মধ্যে একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করেই এ পরিচ্ছেদের ইতি টানতে চাই। তারপর পরবর্তী পরিচ্ছেদ।

একদিন দুপুরে আহারের জন্য আমি একটি শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁয় গেলাম। দিনের বেলাতেও আধো-অন্ধকার, পরিবেশটি শান্ত, আমার প্রিয় জায়গা। দুপুরে বাইরে খেতে হলে আমি এখানেই আসি। বেয়ারা সকল আমার পরিচিত। আমি একটি কোণ নিয়ে বসলাম। বেয়ারা খাবার অর্ডার নিয়ে গেল এই পরিবেশে সহসা একটু হাসির নিকণ, একটু সুরের ঝংকার বেজে উঠলে খারাপ লাগে না। আমারও লাগছিল না। রক্ষে এই, এখানে কোনরকম মিউজিক নেই।

একটি মেয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল, চিনলাম, শর্মিষ্ঠা ও বেশ সুন্দর করে বলল, 'আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম।'

রেস্তোরাঁয় ঢুকে ওকে আমার চোখে পড়ে নি। বললাম, 'কি ব্যাপার, তুমি এখানে?'

শর্মিষ্ঠা বেশ স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'আমি যে ভদ্রলোকের সঙ্গে এসেছি, তিনি একজন ফিল্ম প্রোডিউসার। উনি অবাঙালী, কিন্তু আপনার খুব ভক্ত, বাংলা পড়তে পারেন। আমি

আপনাকে দেখিয়ে দিতেই উনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন। আসবেন একটু আমাদের টেবিলে?'

অস্বস্তি বোধ করলাম। কিন্তু আমি শর্মিষ্ঠাকে আমার টেবিলে বসতে বলতে চাই না। আমি উঠেও দাঁড়াই নি। লোকের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহারও করতে পারি না। ইচ্ছা না থাকলেও আমি বললাম, 'তুমি যাও আমি যাচ্ছি।'

শর্মিষ্ঠা ওর টেবিলের দিকে গেল, আমি লক্ষ্য করলাম সেখানে স্যুটেড বুটেড, চোখে চশমা, মাঝবয়সী একজন বসে ছিলেন। আমার চোখ তাঁর দিকে পড়তেই তিনি দূর থেকে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। আমাকে নমস্কার ফিরিয়ে দিতে হল। আঙুলের ইশারায় বেয়ারাকে ডেকে একটু দেরিতে খাবার পরি-বেশনের নির্দেশ দিয়ে আমি শর্মিষ্ঠাদের টেবিলে গেলাম। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, 'দাঁড়াচ্ছেন কেন, বসুন।'

উনিও বাংলাতেই বললেন, 'আপনি বসুন।'

আমি বসলাম। শর্মিষ্ঠা বলল, 'ইনি সুরেন্দ্রকুমার জৈন, ফিল্ম প্রোডিউসার।'

সুরেন্দ্রকুমার বললেন, 'না না, ওটাই আমার পরিচয় না, আমার অন্য বিজনেস্ আছে। ফিল্ম লাইনে আমি নতুন। দাদা সব ফিল্ম প্রোডিউসারকেই চেনেন।'

'দাদা' মানে আমি। বললাম, 'তা ঠিক বলতে পারি না। কলকাতায় বোধহয় কয়েক হাজার প্রোডিউসার আছে।'

এমনি দু'চার কথার পরে জানা গেল, সুরেন্দ্রকুমার বর্তমানে একটি ছবি করছেন, যার নায়িকা শর্মিষ্ঠা, এবং পরবর্তী ছবির জন্য তিনি আমার একটি গল্প চান। খেতে এসে ব্যবসার কথাবার্তা আমি পছন্দ করি না। কিন্তু সে কথা বলা যায় না। আমি ওঁকে বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে একদিন আসতে বললাম। শর্মিষ্ঠাকে খুবই খুশি আর গর্বিতা মনে হল। 'ও যেন আমাকে খানিকটা বুঝিয়ে

দিতে চাইল, নিজের চেষ্টাতেই ও চিত্রতারকা হতে পারে। এবং ও আমাকে নাম ধরে দাদা বলে বেশ আদরের সঙ্গে বলল, 'একটা খুব ভালো গল্প দিতে হবে, আমাকে যাতে ভালো স্যুট করে।'

এ সব কথা অত্যন্ত বিরক্তিকর, যদিও শুনতে হয়। ওদের সঙ্গে খেতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমি হাসিমুখেই ক্ষমা চেয়ে, বিদায় নিয়ে, আমার টেবিলে ফিরে গেলাম।

পরবর্তী পরিচ্ছেদটা কিন্তু একেবারে ভিন্ন। না, আমি কাগজ-পত্রে কোথাও শর্মিষ্ঠার ছবি বা নাম দেখি নি। সুরেন্দ্রকুমারও কোন দিন আমার কাছে আসেন নি। বেশ কিছুদিন আমি শর্মিষ্ঠাকে দেখতেও পাই নি। সিদ্ধান্তগুলো মিলে যাচ্ছে মনে করে মনে মনে ঠোঁটের কোণে হেসেছি। মেয়েটির প্রতি যে করুণা হয় নি, তাও বলতে পারি না। বেচারী কোথায় ভেসে গিয়েছে কে জানে। কোন্ অন্ধকারে কে জানে।

কিন্তু আমার হাসিটা, অনেকটা চপেটাঘাতের মতই, আমার মুখে ফিরে এল। বেশ কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। আমি উত্তর কলকাতায়, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। বন্ধুর বাড়ির সামনেই ছোট একটা পার্ক আছে। সেখানে একটা সভা চলছিল। পতাকা আর ফেস্টুন ইত্যাদি দেখেই বোঝা যায়, রাজনৈতিক সভা, এবং আশ্চর্য, মঞ্চে বক্তৃতা করছে শর্মিষ্ঠা।

এক নতুন শর্মিষ্ঠা। ও ডান হাতে মাইক চেপে ধরে, বাঁ হাত তুলে আক্রমণের ভাষায় বক্তৃতা করছে। ওর মুখে দীপ্তি, চোখে ঝলক, ওকে যেন একটি অগ্নিশিখার মত দেখাচ্ছে। বক্তৃতার বাচনভঙ্গি যেমন স্পষ্ট, তেমনি তীব্র। আমি কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই দুবার পার্ক করতালিতে মুখর হয়ে উঠল, ধ্বনি উঠল, 'শেম্ শেম্!'

সত্যি, না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না, শর্মিষ্ঠা এমকম অ্যাজিটেটিং বক্তৃতা দিতে পারে। শ্রোতাদের চোখ-মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তারা কী রকম উত্তেজিত। বন্ধুর বাড়ির দিকে যেতে যেতে ভাবলাম, যাক্, শর্মিষ্ঠা এবার নিজের জন্য একটা পথ খুঁজে পেয়েছে। ওকে আজ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। ওর রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে হয়তো আমার মিল নেই, তবু ভালো লাগে, আর মনে মনে ভাবলাম, আমাদের পুরনো সিদ্ধান্তগুলো বাতিল করা উচিত। আমি আজকের যুগ আর যুগের তরুণ-তরুণীদের গতি-প্রকৃতি বোধহয় বুঝতে পারি না। যেন খেই হারিয়ে ফেলছি। তা না হলে শর্মিষ্ঠাকে করুণা করে হাসতে যাব কেন।

না, শর্মিষ্ঠাকে আর রেস্তোরাঁয় হোটেলে ক্লাবে নানান লোকের সঙ্গে কখনো দেখতে পাই নি। শর্মিষ্ঠা অন্য জগতে চলে গিয়েছে।

একদিন দেখলাম, শর্মিষ্ঠা একটি দুরন্তগতি গর্জিত মোটরবাইকের পিছনে বসে যাচ্ছে। ওর চুল উড়ছে, শাড়ি উড়ছে। মোটরবাইকের চালক একটি যুবক, যার ট্রাউজারের ওপর গুরুপাঞ্জাবি, মাথায় বড় বড় চুল, গালপাট্টা জুলফি, চোখে সানগ্লাস। বোধহয় ওর দলেরই কোন বন্ধু। কিন্তু কিছু আন্দাজ করতে যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না। কেন না, মেলে না।

শেষ পর্যন্ত সত্যি মিলল না।

কয়েক দিন আগে একটি বিশেষ সভায় আমি আমন্ত্রিত ছিলাম। যেহেতু সভার আয়োজনটা মূলত রাজনৈতিক এবং কিছুটা সরকারী, সেজন্য আমার বিশেষ উৎসাহ ছিল না। কিন্তু এক অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক দাদা কিছুতেই ছাড়লেন না, নিয়ে গেলেন। সেই মহতী সভায় মন্ত্রীরাও দু-একজন এসেছেন। এবং আমি অবাক হয়ে দেখলাম, শর্মিষ্ঠা একজন মন্ত্রীকে তাঁর নাম ধরে দাদা বলে তাঁকে মঞ্চের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর সঙ্গে হেসে কথা বলছে। আরো অনেক মানী ব্যক্তির সঙ্গেও ওকে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে

দেখলাম এবং দেখলাম ওরও যথেষ্ট খাতির। তারপরেই লালপাড় শাড়ি পরা শর্মিষ্ঠা মঞ্চের সামনে মাইকের দিকে এগিয়ে এল। এ শর্মিষ্ঠা সেই পার্কের নেত্রী না। এখন সে শান্ত গম্ভীর দীপ্তিময়ী।

কিন্তু আমি হকচকিয়ে যাচ্ছিলাম অন্য কারণে। পার্কের সভায় যে রাজনৈতিক দলের নেত্রী হিসাবে ওর বক্তৃতা শুনেছিলাম, আজকের এই দল তো সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং আগের দলের তুলনায় একেবারে বিপরীত! একেবারে আদা থেকে কাঁচকলায়! শর্মিষ্ঠা এখানে, এ দলে এল কেমন করে? বিচিত্র পরিবর্তন।

তবে কিছু আন্দাজ করতে যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না, কারণ মিলবে না। কিন্তু শর্মিষ্ঠাকে আজ আমার সত্যি নায়িকা বলে মনে হচ্ছে। শান্ত, কিন্তু ওর স্বরে তথাপি নিহিত আছে উত্তেজনা। ও শত্রুপক্ষের সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাষায়। কথাগুলো সকলেরই জানা। পুনরুক্তি সম্ভাবনায় আর উল্লেখ করলাম না।

কীর্তিনাশী

ওকে মহিলা বলবো, না মেয়ে বলবো, তা বুঝতে পারছি না। একটা বয়সের যে কোন নারীকেই, ভদ্রলোকের মতো উল্লেখ করতে হলে, মহিলা বলাটা প্রচলিত। প্রচলন যাঁরা করেছেন, তাঁদের মতিগতি সহজে বোঝবার নয়। মহিলার ইংরেজি কী? কারণ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রচলন যাঁরা করেছেন, তাঁরা খুব একটা ভারতীয় মনোভাব নিয়ে করেন নি। মহিলা বললেই একটি সমীহের ভাব ফুটে ওঠে। কিন্তু মহিলা শব্দের ইংরেজি কি লেডি? লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন—ভদ্রমহিলাগণ এবং ভদ্রমহোদয়গণ, এই রকম বোঝায়। আর মেয়ে? কন্যা অর্থেও মেয়ে বোঝায়। একটি মেয়ে বা মেয়েটি কি এ উওম্যান না দ্য গার্ল?

সচরাচর মহিলা বললে, একটা দূরত্ব সমীহ এবং একটু বেশি বয়সের চিন্তাটাই যেন মনে আসে। মেয়ে বললেই যেন বয়স কমে আসে। মনে হয়, অবিবাহিতাদের মেয়ে বললে তেমন কটু শোনায় না। কিন্তু একটি আঠারো বছর বয়সের বিবাহিত তরুণীকে মহিলা বললে কেমন যেন শ্রবণে বাজে। আসলে সব ব্যাপারটাই চরিত্র ও পরিবেশের শিক্ষা দীক্ষা ধ্যান ধারণার ওপর নির্ভরশীল। আমার মনে আছে, ঢাকায় এক অভিজাত মুসলমান মহিলা 'যুবতী' শব্দে আপত্তি করেন। পরিবর্তে 'তরুণী' শব্দ ব্যবহার রুচিকর বলেছিলেন। অবিশ্যি তিনি শিক্ষিতাও। আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল,

তিনি 'নারী' বা 'রমণী' কোনটা বেশি রুচিকর জ্ঞান করেন। করিনি, কারণ, আমি জানতাম, তিনি 'নারী'কেই ভোট দেবেন। যুবতীর সঙ্গে যৌবন শব্দের যেমন একটা নৈকট্য আছে তেমনি রমণীর সঙ্গে সম্ভবত রমণের। মহিলাটির মানসিক জগতের কিঞ্চিৎ হদিস এতে মিলে যায়। তারপরে ভাবুন, বাঙ্গালী হিন্দুদের নাম যদি হয় রমণীমোহন, কী লজ্জা, কী লজ্জা! যুবতীমোহন হলে তো কথাই ছিল না। ঢাকার সেই মহিলার কথা শুনে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের কথা মনে হয়ে যায়।

কিন্তু ধান ভানতে শিবের গীতের মতো হয়ে যাচ্ছে। আমি যা বলতে চাই, তা-ই বলি এবং আমার মতো করেই বলি। যাঁর কথা আমি বলতে যাচ্ছিলাম, তাঁকে আমি প্রথমেই মহিলাই বলি। কারণ, প্রথম দর্শনেই ও পরিচয়ে, তাঁকে আমার তা-ই মনে হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় একটি ক্লাবে। নাম সুচেতা অধিকারী।

আমারই এক বন্ধু ক্লাবে নিমন্ত্রণ করেছিল। নিতান্ত তাস খেলা বা আড্ডার জন্য না, রাত্রের খাবার ব্যাপারও ছিল। তা ছাড়া, আমি তাস খেলতেও জানি না। আমার বন্ধু সুচেতা অধিকারীর সঙ্গে শুধু পরিচয় করিয়ে দেয়নি, সকলের অলক্ষ্যে সুচেতাকে দেখিয়ে একটি ইঙ্গিতসূচক কথা বলেছিল, যা থেকে আমাকে বুঝে নিতে হয়েছিল সুচেতার সঙ্গে তার সম্পর্কটা, আমরা যাকে বলে থাকি নিষ্পাপ, তা নয়। বন্ধুটি আমার মোটামুটি ঘনিষ্ঠ, অতএব সে বিবাহিত হলেও তার জীবনের এরকম একটি গুপ্ত কথা বলতেই পারে। সুচেতা তখন চোখের পাতা নিবিড় করে একটু অপ্রস্তুত লজ্জায় হেসে বলেছিলেন, 'কী বলা হচ্ছে, শুনি? বাজে কথা একটাও বলো না।'

বন্ধু হেসে বলেছিল, 'যা বলছি, সবটাই কাজের, জিজ্ঞেস করে দ্যাখো।'

বলা বাহুল্য, সুচেতা আমাকে তা জিজ্ঞেস করতে পারে না, করেনও নি, কারণ, ওর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় উনি বুদ্ধিমতী। আমার বন্ধু কী বলে থাকতে পারে সে অভিজ্ঞতা ওর আয়ত্তে আগেই ছিল। উনি শুধু হেসেছিলেন, বলেছিলেন, 'ওর কথা একদম বিশ্বাস করবেন না।' বলে এমনভাবে হেসেছিলেন, যেন আমাকে বিশ্বাস করবার অধিক কিছু জানিয়েছিলেন এবং পরে, আমার সঙ্গে যেরকম ঘনিষ্ঠভাবে সুচেতা কথাবার্তা বলেছিলেন, বোঝা গিয়েছিল, আমার সঙ্গে ওর বন্ধুত্বের কোন বাধা নেই। কথাবার্তায় মনে হয়েছিল সুচেতা অধিকারী অশিক্ষিতা নন। জানা গিয়েছিল, তিনি একটি চাকরিও করেন এবং অবিবাহিতা।

বন্ধুর ভাগ্যটি প্রায় ঈর্ষা করবার মতোই। চাকুরিজীবী, শিক্ষিতা, অবিবাহিতা এবং তারপরেই হাউইয়ের জ্বলে ওঠার মতো একটি প্রজ্বলিত বর্ণাঢ্য আলোর মালার মতোই, পাত্রী চাই-ওয়ালাদের কাছে দারুণ সংবাদ, উজ্জ্বল শ্যামা, স্বাস্থ্যবতী, নাক সামান্য বোঁচা, কিন্তু কালো ডাগর চোখ। বয়স ? এখানে একটু গোলমাল আছে, কারণ সত্যি বললে, আটাশ বলতে হয়, অন্যথায় মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজে যেটা প্রচলিত, আঠারো বলতেই বা অসুবিধা কী ? বয়সের ছাপ ? একটা কথা তো জানতেই হবে- বয়সের ছাপ যাদের ফুটে ওঠে তারা নিতান্ত গ্রাম্য আর নিজের সম্পর্কে অচেতন। আজকাল অনেক চল্লিশ.চতুর্দশীর মতো চঞ্চলা বালিকা। হাসিতে খুশিতে ছুটতে দৌড়ুতে প্রগলভতা এমনিই, বয়সের ছাপ-টাপ আপনা থেকেই ঝরে যায়।

আমাদের অগ্রজপ্রতিম এক বিশিষ্ট সমাজ-বিজ্ঞানী একদিন বলেছিলেন, আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি, মেয়েরা অকালেই বুড়িয়ে যেতো, আর আজকাল প্রত্যেকটি মেয়েকেই মনে হয়, ফিটফাট সুন্দর। আমার স্ত্রীকেই তো দেখি, তিনি যেন দিন দিন যুবতী হচ্ছেন। একটা কী রহস্য ওরা আবিষ্কার করেছে।

কথাটা শুনে হেসেছিলাম, কিন্তু মনে মনে তাঁর কথা অনেকখানি মেনে নিয়েছিলাম। যাই হোক, সুচেতা অধিকারীর রূপ আর স্বাস্থ্যের জন্য এত কথা বলার দরকার নেই। তার সবই ভালো, বক্ষ, কটি এবং নিতম্ব বেশ মানানসই, কিন্তু মেদের ব্যাপারে বিপদ সংকেতের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছেন। মেদ একটু বাড়লেই ওঁর এই সুঠাম শরীরের রূপ পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। মনে হয়, সুচেতা অধিকারী সে বিষয়ে নিশ্চয় সচেতন আছেন, কারণ দেখে শুনে মনে হয়েছিল তিনি নিজের সব বিষয়েই সচেতন। পোশাক প্রসাধন বিষয়েও। আমার বন্ধুর সঙ্গে প্রথম যে দিনটিতে তাঁকে ক্লাবে দেখেছিলাম, সেদিন তিনি রঙ মেলানো শাড়ি জামা শ্লিপার সাণ্ডেল কপালের ফোঁটা, কানে ফুলের এবং গলায় পাথরের মালা পরেছিলেন এবং বলাই বাহুল্য, ওঁর শ্লিভলেস জামার গলা আর কাঁধের হ্রস্বতা নিটুট বক্ষের আপাত উদাসীনতায় আসলে একটি সর্বনাশের সংকেতই জাগিয়ে রেখেছিলেন, তদুপরি নির্লোম নিভাঁজ মেদহীন শ্রোণীদেশ, নাভির নিচের শাড়ি বন্ধনীতে যেন রীতিমতো একটা উস্‌কে দেবার চ্যালেঞ্জ।

সুচেতা অধিকারীর ঠোঁট অনেকটা পানকৌড়ী পাখির মতোই স্কচ্ অন্ রকের পাত্রে ডুব দিচ্ছিল। অকল্পনীয় নয় কী? বরফ গলা জলটুকু বাদ দিলে, নীট্ হুইস্কিতে ওরকম নিবিড় চুমুক, এক কথায় কলিজার জোর থাকা দরকার এবং তা ওঁর ছিল। হতে পারে, একটু প্রগলভ হয়েছিলেন, দ্রব্যগুণ বলে একটা কথা তো আছে। গালে আর চোখে রক্তাভাও লেগেছিল ওঁর। যৌবনের আগুন আরো লেলিহান করে তুলেছিল। কারণ সেই রক্তিম কটাক্ষ অনেকটা মিছরির ছুরির মতোই। কাটলেও মিষ্টি। কিন্তু ওঁর কথা ছিল স্পষ্ট, শালীন এবং ল্যাস ছাড়া কোনো বিকৃতি ভঙ্গি দেখিনি।

মুগ্ধ না হবার কোনো কারণ নেই। ক্লাব, তাস খেলা, সুরা তার

মাঝখানে সুচেতা অধিকারীর মতো. বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষায়, যোবতী নারীর সান্নিধ্য কার না ভালো লাগে ? ঘর সংসারের কথা আলাদা, ক্লাবে এমনটিই তো মানানসই। অবিশ্যি কেউ কেউ ঠোঁট বাঁকাবেন, কিন্তু আসলে আমরা তো অন্তরে চরিত্রে বিশ্বাসে পুরো ফিউডাল। জানি, অনেকেই চিৎকার করবেন, করছেনও, কিন্তু আমরা তো আর দেশ-গাঁ ছাড়া ভুঁইফোঁড় না। ভাববাদী থেকে বস্তুবাদী, সকলের কীর্তিকলাপ আচার আচরণই দেখছি। সারা ভারতে আধ ডজন ইনডিভিজুয়ালের কথা আলাদা, কোটি কোটি মধ্যবিত্তের মধ্যে সেটা এমন কিছু না। সেই আধ ডজনের মধ্যে কেউ লেনিন মাও সে তুং-এর পদনখকণার যোগ্য কী না, তাও বিচার্য।

যাই হোক. আবার সেই শিবের গীত হয়ে যাচ্ছে। আমার বন্ধু, নামটা বলেই ফেলি, সত্যশরণ—আমরা সত্য বলেই ডাকি, তার সঙ্গে প্রথম সুচেতা অধিকারীকে দেখেছিলাম। রাত্রি এগারটা পর্যন্ত ভালোই কেটেছিল। পরে সত্যর কাছে শুনেছি সুচেতা অধিকারীকে নিয়ে ও গভীরভাবে চিন্তা করছে। ওর স্ত্রী সুচেতার কথা জানতে পেরেছে, তা নিয়ে সংসারে প্রতিদিন অশান্তি লেগেই আছে। সে অশান্তি মারাত্মক। জিনিসপত্র ভাঙাচোরা, চিৎকার চেঁচামেচি, এমন কি হাতাহাতি মারামারি পর্যন্ত। সত্যর স্ত্রী নাকি ওর টাই ধরে একদিন এমন টেনেছিল গলায় রীতিমত ফাঁস লেগে গিয়েছিল। নিতান্ত পরমায়ু ছিল বলেই দম বন্ধ হয়ে মারা যায়নি। সত্যর বিরুদ্ধে পাড়ায়ও জানাজানি হয়েছে।

শেষ সংবাদ পেয়েছিলাম, সত্য আলাদা ফ্ল্যাট নিয়েছে, পরিবারের সঙ্গে আর থাকে না। বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার সম্ভাবনা। সত্য পশ্চাদ্‌পদ না। ও স্বীকার করতে রাজী আছে, সুচেতার সঙ্গে ওর অ্যাফেয়ার আছে, অতএব বিচ্ছেদ অনিবার্য।

এই সব সংবাদের মধ্যে, সুচেতার কথা আমার মনে পড়ে যায়।

আমি ওঁর বাইরেটা দেখেছি, যা নিশ্চিতরূপেই পুরুষকে মুগ্ধ করে। ভিতরের সংবাদ জানা নেই, অর্থাৎ ওঁর হৃদয়বৃত্তির সংবাদ, যাকে বলে প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি! তবে সত্যর মতো পুরুষের এতোখানি অগ্রসর হওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই সুচেতার হৃদয়াবেগও কাজ করছে।

তবু খারাপ লেগেছিল, কষ্ট পেয়েছিলাম। বন্ধুর সংসার ভেঙে যাওয়া কে আর চায়! বুঝতে পারি, আমরা অনেক সময়ই পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের শিকার হয়ে পড়ি। তথাপি আমি সুচেতার দোষ দিতে চাই না এই কারণে, যেহেতু তাঁর মহত্ত্ব নেই, কিন্তু ভালোবাসার টান তো আছে। মহৎ মহীয়সী কজনাই বা আছেন, সাধ্বী চরিত্রই বেশি। সব জেনেশুনে একটি বিবাহিত এবং ওঁর থেকে একজন বয়স্ক লোককে নিয়ে এমন ভেসেই বা যাবে কেন। বিশেষ করে যে মেয়ে নিজে উপার্জনশীলা। সত্যর কাছেই জেনেছিলাম, সুচেতা অধিকারী টাকা পয়সার ব্যাপারে খুব নির্লোভ। এমন কি, উপঢৌকনেও বিব্রত আর অস্বস্তি বোধ করেন। আসলে সুচেতা চান, দুটি প্রাণের আবেগ ভরা নিবিড় একটি সংসার। অতএব কী-ই বা আর বলা যায়।

ছ'মাসের মধ্যেই সত্যর ঘটনাগুলো ঘটে যায় এবং ছ'মাসের মধ্যে সুচেতা অধিকারীকে আমি আর দেখিনি। অপেক্ষায় ছিলাম সত্য একদিন ওর আর সুচেতার নতুন সংসারে নিমন্ত্রণ করবে। কিন্তু সুচেতাকে হঠাৎ দেখে আমাকে নতুন করে ভাবতে হলো।

এবার দেখা হলো এক হোটলের ক্যাবারে রুমে। দেখলাম সুচেতার ঠোঁটে সিগারেট ঈষৎ কাঁপছে। গালে এবং চোখে রক্তাভা। পোশাক প্রসাধনে কোনো ত্রুটি নেই। মদিরেক্ষণা বলতে যা বোঝায় চোখ দুটি সেই রকম দেখাচ্ছিল, এবং সেই চোখের দৃষ্টি যাঁর প্রতি নিবদ্ধ, তিনি সত্য না অন্য একজন, আমার অপরিচিত। আমি

কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বসেছিলাম, তারা কেউ সুচেতাকে চেনে না। আমি ভারী অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সত্যের ঘটনা জানার পরে আর একজন ব্যক্তির সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে সুচেতাকে বসতে দেখে সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। ওঁর গায়ে গা ঠেকানো ভদ্র-লোকটিকে আপাতত যতই আবেগপ্রবণ দেখাক, বেশ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন বলেই মনে হচ্ছে। বয়সও চল্লিশের উর্ধ্বেই দেখাচ্ছে এবং পোশাক-আশাকে ছাড়াও মানুষের চোখে মুখেই তার বিদ্যা-বুদ্ধির ছাপ পাওয়া যায়। আমার চোখে ভদ্রলোককে বেশ সম্ভ্রান্ত মনে হলো। সুচেতা অধিকারী ভদ্রলোকের সঙ্গে এমনই নিবিড় আলাপনে, এবং হয়তো আরো কিছুতে মগ্ন, আমি তো দূরের কথা নাচের দিকেও তাঁদের বিন্দুমাত্র খেয়াল ছিল না।

পরের দিন অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সত্যকে ওর কারখানায় (ওর নিজের একটা ছোট-খাটো কারখানা আছে) টেলিফোন করলাম। সত্যর গলার স্বর যেন স্খলিত আর মোটা শোনালো। আমি এমনি খবরা-খবর জিজ্ঞেস করলাম, সত্যও সেই রকম জবাব দিল। তারপরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ও ওর নতুন ফ্ল্যাটেই এখনো আছে নাকি। জানালো, তা-ই আছে। ওর গলার স্বরে তিক্ততার ঝাঁজ, পরিষ্কার জানিয়েই দিল, সুচেতার সঙ্গে ওর আর কোনো সম্পর্ক নেই। ওর বিবাহ-বিচ্ছেদ আপাতত স্থগিত আছে, তবে আর কখনোই পুরনো সেই সংসার ফিরে আসবে না। সেটা ভেঙে গিয়েছে।

আমি ওর ওপর দিয়েই জানতে চাইলাম, সুচেতাকে ও ভালো চিনতো, দুজনের মধ্যে বোঝাপড়াও হয়েছিল, তবে এরকম হলো কেন? জবাবে ওর বিষণ্ণ স্বর শুনতে পেলাম, 'সুচেতাকে আমি চিনতে পারিনি, আজও না। কেন যে ও আমাকে ছেড়ে গেল, আমার কাছে তা স্পষ্টই না।'....

আমি অবিশ্যি খুব আশ্চর্য হলাম না। সুচেতা অধিকারীর

মতো স্বৈরিণীর অভাব কলকাতায় নেই, এবং যারা এরকম স্বেচ্ছাচার করে, তারা টাকা পয়সার জন্য নাও করতে পারে। স্বেচ্ছাচারিতাই ওর আনন্দ এবং সুখ। কিন্তু পুরুষের পক্ষে সব সময় এসব চরিত্র বুঝে ওঠা কঠিন, তখন ভেসেই যেতে হয়। সতার কথা ভাবলে ভয় আর কষ্ট দুই-ই হয়। ওর সবদিকই গেল। সংসার স্ত্রী পুত্র গেল, সুচেতাও ছেড়ে গেল।

অতঃপর, গত ছ' বছরে, প্রায় .আধ যুগ ধরে সুচেতাকে আমি আরো কয়েকবার দেখেছি। প্রত্যেকবারই ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সম্পন্ন ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছে। কখনো অল্প বয়সের ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে দেখিনি, রঙ্গিনীদের পক্ষে যেটা স্বাভাবিক। ধরে নিয়েছিলাম সুচেতা অধিকারীর স্বৈরিণীবৃত্তির ওটাও একটা বৈশিষ্ট্য বোধহয়। যতোবারই ওকে আমি দেখেছি যার সঙ্গেই থাক খুবই নিবিড়। কখনো ওর সঙ্গে আমার দৃষ্টিবিনিময় বা কথা হয়নি।

এ নিয়ে ভাববার কিছু ছিল না।

তথাপি ভাবতে হলো। যাচ্ছিলাম বম্বেতে। দমদম এয়ার পোর্টে এসে জানা গেল সন্ধ্যের ফ্লাইট আধ ঘণ্টা বিলম্বে ছাড়বে। আজকাল এটা নিয়মেই দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আবহাওয়া ভাল খারাপে কিছু আসে যায় না, ফ্লাইট সব সময়েই বিলম্ব।

লাউঞ্জের এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে করতে ডাইনিং হলে গেলাম। তেমন ভিড় নেই। একটু চা পানের ইচ্ছে নিয়ে যে টেবলে বসলাম দেখলাম তার দুটো টেবলের পরেই অন্য টেবলে সুচেতা অধিকারী বসে। পাশে, আশ্চর্য, আমারই অত্যন্ত চেনা এক বন্ধু রতীশ হালদার, বেসরকারী ফার্মের বড় চাকুরে। বেশ অবস্থাপন্ন, কলকাতায় নিজেদের বাড়ি গাড়ি এবং ওর সংসারও বেশ সুখের বলেই জানতাম। ও সুচেতার সঙ্গে এখানে কি করছে?

রতীশকে দেখছি মুখে কয়েকদিনের গোঁফ দাড়ি। চোখের কোল বসা, জামা কাপড়ও তেমন পরিচ্ছন্ন না, চোখ লাল মুখ বসা।

সে করুণ কাতরভাবে কিছু বলছে। আর সুচেতা শক্ত মুখে মাঝে মাঝে একটু ঘাড় নাড়ছে। সুচেতার যেমন সাজগোজ থাকার কথা তেমনি আছে। রতীশ একবার সুচেতার হাত চেপে ধরলো, সুচেতা হাতটা জোরে ছাড়িয়ে নিল, রীতিমতো বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ।

আমার মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গেল। চা পানের তৃষ্ণা আর বোধ করলাম না, উঠে বেরিয়ে গেলাম। ভাবলাম, রতীশটা আবার এই স্বৈরিণীর পাল্লায় পড়লো কী করে? এরা কি কেউ কোনো খবরই রাখে না? রতীশের সংসারের ছবিটা আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো।

যথাসময়ে প্লেনে উঠে 'গয়ে দেখলাম, সেই প্লেনের যাত্রী সুচেতা অধিকারীও, এবং সে আমার আগেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। ওকে বেশ খুশি ও অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। আমি প্লেনের ভিতরে গিয়ে মনের মতো জায়গা খুঁজছি, তখনই সুচেতা আমাকে পাশ দিয়ে ডেকে বলে উঠলো, 'আরে আপনি! বম্বে যাচ্ছেন নাকি? আসুন, এখানে বসুন।'

প্রথমটা একটু থমকে গেলাম, তারপরে আত্মধিক্কারেই মনে মনে একটু হাসলাম। দেখা যাক, সুচেতা অধিকারীর দৌড়। আমি ওর পাশেই বসলাম। প্রথমে নিতান্তই বার্তা বিনিময়, ভদ্রতা সামাজিকতা। তারপরে ওর দিক থেকে অনেকদিন পরে দেখা হওয়ার কথা উঠতেই, আমি বললাম, 'আপনাকে আমি অনেকবার অনেক জায়গাতেই দেখেছি।'

সুচেতা যেন একটু বিব্রত আর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তাই নাকি?'

বললাম, 'হ্যাঁ, এবং প্রত্যেকবারেই আপনার সঙ্গে থাকতো নতুন সংগ্রহ।'

কথাটা বলেও মনে মনে ঘাবড়ে গেলাম, যদি অন্যভাবে কথাটা নিয়ে আমাকে যাত্রীদের সামনে অপমান করে? ও জিজ্ঞেস করলো, 'সংগ্রহ মানে?'

হেসে বললাম, 'আপনার সংগৃহীত বন্ধুদের কথা বলছি।'

সুচেতা খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, 'ওহ্। কিন্তু বন্ধু আপনাকে কে বললো? সব তো আমার শিকার।'

স্বৈরিণীর এরকম স্পষ্টবাদীতায় বিস্ময়ের থেকে বিক্ষুব্ধই হলাম বেশি. বললাম, 'সেটা আমি উচ্চারণ করতে চাইনি কিন্তু জানতাম। একটু আগে রতীশকেও দেখলাম।'

'রতীশ! রতীশকে চেনেন নাকি?' ও অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

বললাম, 'সত্যর মতো রতীশও আমার বন্ধু।'

তীব্র স্বরে কথাটা বলে বেশ তৃপ্তি বোধ করলাম। কিন্তু সুচেতা সুন্দর করে হেসে বললো, 'রতীশের বিবাহবিচ্ছেদ পরশু হয়ে গেছে।'

আমি চমকে উঠলেও অত্যন্ত ঘৃণাপ্রজ্জ্বল দৃষ্টিতে সুচেতার চোখের দিকে তাকালাম। সুচেতাও তাকালো। প্রায় মিনিট খানেক চেয়ে থাকার পরে আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম, কারণ সুচেতার ঠোঁট বেঁকে উঠছে, নাসারন্ধ্র ফুলছে, একটা উত্তেজনার ঝলক ওর চোখে মুখে। ও হঠাৎ বললো, 'জানি কি ভাবছেন। ভাবুন, কিছু যায় আসে না কিন্তু কীর্তিনাশার যা কাজ সে তাই করবে।'

'কীর্তিনাশা?' অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

সুচেতা বললো, 'হ্যাঁ লেখক মশাই, এ ক্ষেত্রে কীর্তিনাশীও বলতে পারেন। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটাতে আর সংসার ভাঙার খেলা খেলতে আমি খু-উ-উ-ব ভালবাসি। এটাই আমার জীবনের ব্রত।'

আমি বিস্ময়াকুল অসহায় জিজ্ঞাসু চোখে সুচেতার দিকে

তাকালাম। সমস্ত ব্যাপারটার সুর আর ধ্বনি যেন অন্য রকম বাজছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন এমন মর্মান্তিক ব্রত ?'

'খুবই সহজ।' সুচেতা একটু হেসে বললো, 'আমি এরকম একটি মর্মান্তিক খেলারই শিকার কিনা। এক সময়ে আমারো সবই ছিল।'

আমি নির্বাক। সুচেতার হাসিতে একটা ছায়া নেমে এলো, একবার কাঁধের ভিতর দিয়ে বাইরের আকাশ দেখলো তারপর বললো, 'আমার জীবনের মূল যেখানে প্রোথিত ছিল। আমার স্বামী আর সংসার—বড় ভালোবাসার। পূজা করে পাওয়া স্বামী আর সংসার, সেখান থেকে যখন আমাকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, তখন আমার চারপাশে সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা ঘিরে ছিলেন। কিন্তু কী দেখলাম জানেন ? কারোর কিছু এলো গেল না, নির্বিকার সমাজ, আর বন্ধুরা চেয়ে দেখলো মাত্র। তাই আমিও দেখাচ্ছি আর দেখছি। সত্যি এ খেলার মধ্যেও দারুণ থ্রিল আছে।'

আমি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না, চুপ করে রইলাম। দেখলাম সুচেতা অধিকারীও নীরবে বাইরের আকাশের দিকে দেখছে। এক সময়ে যখন এয়ার হোস্টেস ঘোষণা করল প্লেন ল্যাণ্ড করছে তখন আমি তাড়াতাড়ি সুপ্তোত্থিতের মতো জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু এতে কি শান্তি পেয়েছেন ?'

সুচেতা ঘাড় নেড়ে বললো, 'না। শান্তি অমূল্য বস্তু। খানিক সুখ পাই।'

বললাম, 'কতোদিনই বা এভাবে চালিয়ে যাবেন। একদিন তো থামতেই হবে।'

'নিশ্চয়, যখন থামবার থামবে।' সুচেতা বললো।

আমি বললাম, 'অনেক তো হলো, এবার থামুন না।'

সুচেতা হেসে বললো, 'দেখুন, অনেক কিছু শুরু করা যায়, থামানোটা বোধহয় নিজের হাতে থাকে না। আমি শুরু করেছি, থামাতে শিখিনি। কিভাবে থামে দেখি।'

আমি বললাম, 'আমি জানি।'

সুচেতা অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'জানেন? কিভাবে বলুন তো?'

হেসে বললাম, 'বলবো না।'

সুচেতার চোখে নতুনতর বিস্ময়ের ঝিলিক। ও আমার চোখের দিকে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালো। আমি হেসে বললাম, 'প্লেন ল্যাণ্ড করলো।'

'কিন্তু—?' সুচেতার দৃষ্টি তেমনি। কথা বলতে পারছে না।

আমি বললাম, 'কিছু না, ঠিক আছে। আমি জানি: কিন্তু কখনোই বলবো না।'

আমি যাত্রীদের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। আমার পিছনেই সুচেতা অধিকারী।

—বিল্ব, হাত ছাড়।

—সুমতি!

বিল্বর গলায় উপরোধ, উত্তাপে ভারী।

—না। হাত ছাড়।

স্ফুরিত নাসারন্ধ্র সুমতির। প্রতিবাদ, বিক্ষোভ আর শ্লেষ ওর গলায়। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরা। সমস্ত শক্তি দিয়ে হাতটা টেনে নেবার চেষ্টা করল। টুং-টাং করে ভাঙল কয়েকটা কাঁচের চুড়ি। সামান্য একটু কেটে গেল। আর লাল পুতির মতো এক বিন্দু রক্ত দেখা দিল মণিবন্ধে। তবু বিল্বর শক্ত থাবা থেকে হাতটা ছাড়াতে পারল না।

জোর করতে গিয়ে সুমতির মুখ প্রায় বিল্বর চিবুকের ছোঁয়ায়। এলো খোঁপা ভেঙে পড়েছে অবাধ্য ঘাড়ে। স্বভাবতই শরীর অকুঞ্চিত। তাই আঁচল উচ্ছৃঙ্খল। শাদা ফুল ফুল লাল জামা টান টান উচ্ছ্রিত পিঠে। শৈথিল্যের অবকাশ বুকের কাছে। ওর প্রতিমার মতো চোখে, বিস্মিত, প্রায় ক্রুদ্ধ অনুসন্ধিৎসা। বলল, জোর?

বিল্বর চোখে যেন রহস্য, তবু গম্ভীর। সুমতির চোখের প্রতি নিবদ্ধ চোখ শান্ত, স্থির গেরুয়া রং পাঞ্জাবিটার বোতাম খোলা। কণ্ঠার হাড় আর শক্ত ঘাড়ের অনেকখানি মুক্ত। পিঠের দিকে অনেকখানি সরে গেছে জামা। মোটা ভ্রূর ছায়ায় বিল্বর চোখ দুটি বড় এবং কালো। আর সেই রকমই কালো ওর গায়ের রং। বলল, না সুমতি।

—তবে ?

—তুমি রাগ করেছ ?

—করেছি।

দৃঢ় আর কঠিন স্বরে বলল সুমতি। তবু ওর ঠোঁট কেঁপে গেল। কেঁপে গেল বলেই ও আরো জোর দিয়ে বলে উঠল, করেছি-ই তো। রাগ করেছি।

যতো জোর দিল, ঠোঁট ততো বেশী কাঁপল এবং এবার সুমতির চোখ জলে টলটলিয়ে উঠল। বিল্ব চঞ্চল, নিশ্চুপ। সুমতির চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল সে। এবং এই যেন প্রথম লক্ষ্য করল, সুমতির কপালে তরল সিঁদুরের টিপ্। রৌদ্র ছায়ার মতো, সুমতির আর ওর গায়ের রং। বিল্বর ছায়ার মতো রং-এর কোলে সুমতি যেন সকালবেলার রোদ। এই যেন প্রথম চোখে পড়ল, সুমতির আজানু দুই বাহু কোমল কিন্তু কঠিন। দীর্ঘ প্রায় দোহারা শরীর জুড়ে, লাবণ্য আর ব্রীড়ার সঙ্গে বলিষ্ঠতা ও ব্যক্তিত্বের ভাগ প্রায় সমান। এই হয় তো বিম্বোষ্ঠা এবং পদ্মগন্ধা। কুঞ্চিতকেশিনী না, কিন্তু আকর্ণচক্ষু। নাসিকা উন্নত নয়, কিন্তু একটা তীক্ষ্ণতা আছে এবং এই সেই প্রাচীন বর্ণনার ক্ষীণ কটি, বিশাল--?

বিল্বর ভাবনা শেষ হল না। আঁচলে চোখ মুছল সুমতি। সে জানে, বিল্ব তাকে দেখছে আর ওর চোখে, সুমতিকে দেখা-প্রথম দিনের সেই একই মুগ্ধতা, একই বিস্ময়। ছয় বছরের মধ্যে ওর প্রথম দিনের দেখাটা ঘুচল না। ছয় বছরের মধ্যে সুমতি একটুও পুরানো হল না ওর চোখে। আর তাতে কোনো অবিশ্বাস ছিল না সুমতির। এবং জীবনের নানান টানাপোড়েনের মধ্যে সুখী ছিল সুমতি। আজ, এখনো অবিশ্বাস করে না। কিন্তু জোছনা রাত্রের ঘাসের বুকে কিছু নড়ে ওঠার মতো একটা সংশয়ের ছায়া পড়েছে ওর বুকে। বিল্ব শুধু মুগ্ধ? কেবল বিস্মিত। ভালো লাগার একটা দীর্ঘস্থায়ী উচ্চকিত ঝঙ্কার মাত্র ? আর কিছু নয় ?

ভালো লাগছে না সুমতির, এই বিস্ময়, এই মুগ্ধতা। সংশয় তাকে অসহায় করছে ভিতরে ভিতরে। আর এই অসহায়তা অপমানের মতো বিঁধছে তার মনে। রাগে ও দুঃখে অসহনীয় করে তুলছে বিল্বর সংসর্গ।

ওদের পিছনে, দূরে শহরে আলো জ্বলে উঠেছে একে একে। অন্ধকারকে ঠেলে দিচ্ছে এদিকে। এই মাঠের দিকে। শহরের পরে বাগান, মাঠ আর রেললাইন পেরিয়ে, এই নীচু নির্জন চাষের জমির দিকে। গ্রামের লোকেরা ফিরে গেছে। পাখিরা চুপ করেছে। আর এখন বাতাস উতলা হল। গাছেরা সারা শরীর দুলিয়ে মাতালের মতো এলোমেলো হয়ে উঠল।

সুমতির হাতটা তখন শিথিল হয়ে এসেছে বিল্বর হাতের মধ্যে। সুমতি দেখল, বিল্বর চোখ তার মুখের দিকে। হাজার তাকাক, রাগ কমছে না সুমতির। আজ একটি দিন, আর একটি প্রথম দিন বলা যায় দু'জনের জীবনে। কিন্তু বিল্ব তাকে বিমুখ করেছে, দুঃখ দিয়েছে, কাঁদিয়েছে, ভয় ধরিয়েছে।

সুমতি বলল, তোমার ইচ্ছে মতো সব পুরনো হয়ে যায় না।

বিল্ব গম্ভীর গলায় বলল, যথা?

—যথা, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ.....।

—ওটা বিবাহ নয় সুমতি।

—তবে মিলন?

—সঠিক মানে বহন করছে না। শব্দটা বলতে পারতাম, তুমি রাগ করবে। এই যেমন ধর আহার বিহার...। সুমতি বাধা দিয়ে উঠল, বুঝেছি। বেশ, তাই না হয় হলো। মানুষের এসব ব্যাপারগুলো কী কোনোদিন পুরনো হবে?

বিল্ব বল— না। পুরনো হবে না। নতুনও হবে না। ওটা জীবজগতে একটা চিরন্তন ব্যাপার। এসব ব্যাপারে মানুষ আর পশুর মধ্যে কোন তফাত নেই। কিন্তু শোন সুমতি—

—না।

সুমতি প্রায় ঝেঁজে উঠল।—আমার কথার জবাব দাও। আর ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব মাতৃত্ব....?

যেন তিনটি তীক্ষ্ণ চোখে বিল্বকে বিঁধল সুমতি। তার কপালের টিপ্‌টি আর একটি চোখের মতোই দেখাচ্ছিল। বিল্ব এক মুহূর্ত চেয়ে রইল। ঢোক গিলল। ভয়ে নয়, জানে সুমতি। এর অর্থ, সুমতির এ রাগ এবং ঝাঁজও ওকে মুগ্ধ করছে। ওর ঠোঁট তৃষ্ণায় শুকিয়ে উঠেছে। অন্য সময় বিল্বর এরকম চাউনি এবং ঢোক গেলা দেখলে সুমতি ঠোঁট ফুলিয়ে চাপা গলায় বলত, অসভ্য। এবং সেই মুহূর্তে সুমতির নিজেরই তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যেত। কিন্তু এখন পিত্তি জ্বলে গেল সুমতির।

বিল্ব একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, ওসবও ছিল, আছে এবং থাকবে! কিন্তু ও-ব্যাপারগুলো এক এক সময়ে এক এক রকম সমস্যায় পড়েছে আর নানানভাবে উদ্ধার পেতে চেয়েছে।

—আর এ যুগে তো ওসব নোংরা, জঘন্য। কোনো মহত্ত্ব নেই, গৌরব নেই, না?

তীব্র বিদ্রূপে চোখের কোণ দুটি কুঁচকে উঠল সুমতির।

বিল্ব তেমনি শান্ত এবং মোটা গলায় বলল, না। গৌরব মহত্ত্ব, সবই আছে। নোংরা আর জঘন্য জায়গায় টেনে নামাবার এত পাকাপাকি ব্যবস্থা আর কোন যুগে ছিল না। তাই—।

—তুমি যে-ভাবে বলছ, সেই ভাবেই লড়তে হবে।

হেলানো ঘাড়ে, চোখের ধারে, ফণা তোলা উদ্যত সাপের মতো দেখাল সুমতিকে।

বিল্ব বলল, অ্যাঁ? হ্যাঁ লড়াই। লড়াই বলতে পার। সুমতি, আমার কষ্ট হয়, রাগ হয়। আমাদের কালের একটা ভয়ংকর যন্ত্রণার জাঁতাকলে আমরা পড়েছি। অথচ তোমাকে ছেড়ে আমি আর—।

—থাক

সর্বাঙ্গে একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সুমতি। বিল্ব ধরে ফেলল। চুল এবার পুরোপুরি এলো হল সুমতির। বাতাসে উড়তে লাগল। আঁচলটা ছড়িয়ে পড়ল ঘাসের ওপর। মুখ ফেরাল না সুমতি। মাথাটা চিন্তাশূন্য হয়ে গেল একেবারে। কেবল চলে যেতে চায় সে। বলল, ছাড় বিল্ব, আমি আর বসতে পারব না।

—সুমতি?

—কী?

—অবুঝ হয়ো না।

—হব না। এখন তুমি ছাড়, আমি বাড়ি যাব।

আবার জোর করে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সুমতি। কিন্তু বিল্বর টানে, ওর গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। অন্য সময় হলে শঙ্কিত হত সুমতি। সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করত, 'কী যে কর। তোমার লাগে নি তো?' কিন্তু এখন সরোষে ঘাড় বাঁকিয়ে বিল্বর চোখের দিকে তাকাল সে। এত কাছাকাছি যে, দুজনের মুখে লাগল। বিল্বর বুকের গভীরে দৃষ্টি বিঁধিয়ে যেন দেখতে চাইল সুমতি। বলল, কী? যেতে দেবে না?

বিল্ব কি যেন বলতে গেল। কিন্তু বলা হল না। সুমতির শক্ত ঠোঁট দুটির উপর লুটিয়ে পড়ল সে। সুমতি সরে যেতে চাইল। কিন্তু বিল্বর বাহুর বাঁধন ওকে আরো নিকট করল। তারপর মুক্তি পেয়ে, দমকা নিশ্বাস ফেলে, আঁচল দিয়ে জোরে জোরে ঠোঁট ঘষল সুমতি। এবং এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো দু'চোখে তাকাল সে বিল্বর দিকে। অন্ধকারেও তার চোখের ঝিলিক দেখা গেল।

বিল্ব যেন বিহ্বল। ডাকল, সুমতি।

সুমতি চাপা তিক্ত গলায় বলল, তোমার যা খুশি তাই করবে ভেবেছ, না?

বিশ্ব উঠে দাঁড়াল। বলল, না। তুমি রাগ করেছ সুমতি ?

সুমতি চোখ সরাল না বিশ্বর চোখ থেকে। আঁচল কোমর থেকেই মাটিতে লুটানো। সে চুল টেনে এলো খোঁপা ঠিক করতে করতে বলল, তাই আমাকে ঠাণ্ডা করছ!

বিশ্ব নিশ্চুপ। অন্ধকারের একটা আলো আছে। যে আলোয় সব কিছু দেখা যায় অথচ যেন কিছুই ঠিক পরিষ্কার দেখা যায় না। অন্ধকারের আলো, তার নিজস্ব রং, যার মধ্যে এক অস্পষ্টতার সংশয়, অথচ মোহের ভাগ পরিপূর্ণ। সুমতি যেন তেমনি দেখল বিশ্বকে। বিশ্বর দুটি মুগ্ধ আতুর চোখ ওকে নিরীক্ষণ করছে। সে চোখ দেখলে কোনদিনই সুমতি রাগ করে থাকতে পারে না, ওর ভিতর থেকে একটা ঢেউ ভাঙা তরঙ্গের মতো, বিশ্বর বুকের তটে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছে। বিশ্বর এই চোখ, তার কোন লজ্জাই কি রেখেছে? কোন আড়াল, কোন সংকোচ? কিছু না।

তবু আজ এই মুহূর্তে সুমতির মনে বড় সংশয়। বিশ্ব তাকে একটুও বুঝতে চাইছে না। তার মনকে একটুও জানবার চেষ্টা করছে না। সংশয় মানেই তো অবিশ্বাসের ছায়া সেখানে রয়েছে আর অবিশ্বাস রয়েছে বলেই বিশ্বর এই মুগ্ধতা তাকে শান্ত করতে পারছে না। বরং একটা কষ্ট, একটা দুঃসহ রাগ, সব কিছু মিলিয়ে, ক্রমেই একটা অনমনীয়তা ওকে ভিতরে ভিতরে শক্ত করে তুলছে।

বিশ্ব বলল, উঠলে কেন?

—বাড়ি যাব।

সুমতি মাটিতে লুটানো আঁচলটা টেনে গায়ে তুলতে গেল। বিশ্ব তার আগেই হাত বাড়িয়ে আঁচলটা ধরে ফেলল। সুমতি আবার সরোষে তাকাল। বিশ্ব বলল, কিন্তু যে জন্যে এই নিরালা মাঠে এলাম, তা বলা হল না। আবার সেই শহরে, আর লোকজনের ভিড়ে, কোন কথাই বলা যাবে না।

সুমতি সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, কাপড়টা ছাড়।

সুমতি ভ্রূকুটি রাগে ঘাড় কাত করে তাকাল। বিল্ব স্পষ্টই ওর চোখের তারার ঝলক দেখতে পেল। সুমতিও ওর সেই চোখ দেখতে পাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে, ও সহসা হ্যাঁচকা টান দিল কাপড়ে। কিন্তু ছাড়ানো তো গেলই না, খানিকটা ফেঁসে গেল। সুমতি তীক্ষ্ণ গলায় ফুঁসে উঠল, এ সবের মানে কি?

বিল্বর গলা শোনা গেল, তুমি চলে যেতে চাইছ কেন?

—চাইছি, তার কারণ, তোমার সঙ্গে আর কোন কথা বলবার নেই বলে!

—আচ্ছা, সুমো—।

—না।

আদরের ডাকটা শুনেই, আরো যেন ক্ষেপে গেল সুমতি।

বলল, ও নামে তোমাকে ডাকতে হবে না।

—তবে সুমি, সুমতি!

সুমতি যেন অসহায় রাগে এবার কেঁদে ফেলবে। বলে উঠল, একটু লজ্জা করছে না?

—না।

—তা করবে কেন? একেবারে বেহায়া হয়ে গেছ যে।

সুমতির গলায় ঝাজ ও তিক্ততা ঝরে পড়ল। বিল্ব বলল, সে কথাটা এতদিনে বুঝতে পারলে?

—হ্যাঁ, যদিও আরো আগেই বোঝা উচিত ছিল।

—কিন্তু আমি তো প্রথম থেকেই ভীষণ বেহায়া ছিলাম। তুমি তো আমাকে বরাবরই তাই বলে এসেছ।

—এতটা বুঝতে পারি নি।

বলে সে কাপড়টা আবার ছাড়াবার চেষ্টা করল। বিল্ব বলল, [illegible] আরো ছিঁড়ে যাবে।

—তুমি ছাড়বে না?

সুমতির গলা রীতিমতো শক্ত শোনাল। বিল্ব বলল, একটু বস লক্ষ্মীটি। কথা বলতে কী দোষ আছে। তুমি যা চাইবে না, তা তো আর আমি এখুনি জোর করে চাপিয়ে দিতে পারব না। তবে এরকম করছ কেন। একটু বস সুমি।

সুমতি অন্ধকারের আলোয় ভালো করে আবার বিল্বর মুখের দিকে তাকাল। তারপরে ঝুপ করে বসল, যেন অসহায় রাগে আছড়ে পড়ল। বলল, বল। বক্তৃতা দেবে, তাই আমাকে শুনতে হবে। দাও কত বক্তৃতা দেবে শুনে যাই।

বিল্ব বলল, আমি বুঝি তোমাকে বক্তৃতাই দিই?

—যখনই তোমার সত্যি করে কিছু বলবার থাকে না, তখনই তুমি বক্তৃতা দাও।

বিল্ব চুপ করে তাকিয়ে রইল সুমতির মুখের দিকে। সুমতি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল, বিল্বর নীরবতায় একটু পরে ফিরে তাকাল। অন্ধকারেও ঠিক টের পাওয়া যায়। বিল্ব তাকিয়ে আছে, তবে তেমন একটা মুগ্ধ আতুর ভাব নিয়ে নয়। তবু একটা সান্ত্বনা বোধ করল সুমতি, বিল্ব বোধহয় সত্যি গম্ভীর হয়েছে, ভাবছে। এখন বিল্ব রাগ করলেও খুশি হয় সুমতি। তাতেও বোঝা যাবে যে, ও খালি মুগ্ধ নয়, দায়িত্বহীন প্রেমের গভীরতার মধ্যেই ও কেবল ডুবে নেই। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিল্ব যেন অনেকটা অন্যমনস্ক স্বরে বলল, 'আমি খালি বক্তৃতা দিই।' দেয় না, তা সুমতি জানে। কিন্তু এখন মরে গেলেও সে কথা স্বীকার করতে পারবে না সে। জানে, বিল্বর বক্তৃতাগুলো সত্যি বক্তৃতা নয়, যা বলে ভুল বলে না। বরং ওর যুক্তিগুলো কোন রকমেই প্রায় খণ্ডন করা যায় না, যে কারণে এক এক সময় রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। তবু এখন সে কথা স্বীকার কিছুতেই করবে না সুমতি। সে জানে, বিল্ব কখনো মিথ্যে কথা বলে নি, অথচ সংশয়ের ঢেউটা থামছে না, তাই আজ বিল্বর কাছে

কিছুতেই চুপ করে থাকবে না। বলল, দাও বৈ-কি. যখনই সুবিধে বোঝ, তখনই বক্তৃতা দিয়ে আমাকে থামিয়ে দাও।

—যথা?

—এর আগে যখন আমাকে বাড়িতে অপমান করল, তোমার পায়ে ধরে বললাম, আমাকে আর ওখানে থাকতে বলো না, নিয়ে চল, তখনো তুমি হাজারটা বক্তৃতা দিয়েছিলে।

—বক্তৃতা দিই নি, যুক্তি দিয়ে তোমাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম তারপরে তুমিও বলেছিলে, আমি ঠিকই বলেছিলাম। আজ এখন আবার বলছ বক্তৃতা।

—বলছি, তার কারণ, তখন দায়ে পড়ে বলেছিলাম, মন থেকে বলো নি। সে কথা যদি তুমি না বুঝতে পার সে দোষ আমার না।

দৃঢ় শান্ত গলায় সুমতি বলল। বিশু চুপ করে তাকিয়ে রইল। সুমতির মনে হল যেন বিশুর ভুরু কুঁচকে উঠল। আরো একটু সান্ত্বনা বোধ করল সুমতি। নির্বিকার থাকার চেয়ে তবু একটু বিকার আসুক, ওর আচ্ছন্নতা কাটুক। বিশু একটু নাড়া খেয়ে জেগে উঠুক। সুমতির মনে হয়, নিজের চিন্তার বাইরে বিশু যেন একটা ঘুমন্ত সত্তা। সেখানে ওকে কিছুতেই জাগানো যায় না।

বিশু বলল, তার মানে তোমার ভাবপ্রবণতাকে মেনে নিলেই, সব গোলমাল মিটে যায়, এই তো।

সুমতি বলে উঠল, হ্যাঁ, আমার সব কথাই তো ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাস মাত্র। তুমি যা বল, তাই কেবল যুক্তিতে বুদ্ধিতে শান দেওয়া। আমি উঠব এবার

বলতে বলতেই সুমতির গলায় আবার অভিমানাহত ঝাঁজ ফুটে উঠল। কিন্তু বিশু ওর হাত ধরে আছে। ওঠবার উপায় নেই। বিশু বলল, তোমার এই রাগও ভাবপ্রবণতারই রকমফের।

সুমতি আবার ফুঁসে উঠল, বেশ তো, ভাবপ্রবণ মেয়েটার

সঙ্গে মিশতে এসেছিলে কেন? তখন সে কথা ভাবা উচিত ছিল, এখন আর ওসব আউড়ে কি লাভ? আমাকে যেতে দাও।

বিশু বলল, তোমাকে ঠিক ভালোভাবে বলিনি। মেয়ে মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি—।

সুনীতির তিক্ত গলায় বিদ্রূপ তরঙ্গ ধ্বনিত হলো, বড্ড পুরনো হয়ে গেছে কথাটা। আর [illegible] এবার তোমার কথা শেষ হয়েছে তো?

—না, কথা আমার শেষ হয়নি। তা হলে তুমি বলছ রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারটা না মিটালেই একটা কিছু হয়ে যাবে?

সুনীতি ঝাঁজের সঙ্গেই বলল, সেও তোমার ইচ্ছে। তুমি যদি রেজিস্ট্রেশনের চেষ্টা এখনি না করতে পার, করো না।

—তা হলে যে আসবে তার কী হবে? কী বলবে তুমি তাকে? বাইরের লোকজনকে?

—কিছুই বলব না। বলব, যে এসেছে আমার মধ্যে, সেই তার সন্তান, আমি তার মা।

—কিন্তু লোকে বলবে, সব সন্তানেরই একজন পিতা থাকে।

সুনীতির একবার সন্দেহ হল, বিশুর গলায় অজস্র উদ্বেগ যেন থমকে রয়েছে। তাই সে [illegible] একবার তাকিয়ে বুঝে নিতে চাইল. অন্ধকারে কিন্তু বুঝতে পারল না। বলল, লোকেদের সব-কথাও জানা থাকা উচিত, সব কথা জানা যায় না।

—কিন্তু আইনকে কি বলবে? সে লোক নয়, তার চেয়ে বোকা। সে তো জবাব না পেলে ছাড়বে না।

—তার যা করতে হয়, সে তাই করবে। জেলে নিয়ে যাবে? নিয়ে যাবে।

—জেলে হয়ত নিয়ে যাবে না। তোমার ওপর একটা খুব খারাপ চার্জ আনবে। তোমার সন্তান জারজ বলে ঘোষিত হবে।

—হোক, তবু সে আমারই সন্তান। সন্তানের যে বাপ তার যদি গায়ে না লাগে, তা হলে কি বলা যাবে। তার যদি তাতে গৌরব বাড়ে বাড়ুক!

—একে যদি ভাবপ্রবণতা না বলে, তবে কাকে বলে।

—কী করব বল, বিধাতা যে আমাদের ভাবপ্রবণ করেই গড়েছেন। তা নইলে তো বিল্বনাথ বসু করেই জন্ম দিতেন। অর্থাৎ ছেলে হয়ে জন্মাত, এ কথা বলতে চাইল সুমতি। কিন্তু সুমতির বুকের মধ্যে একটা কষ্ট ক্রমে গলার কাছে উঠে আসতে চাইছে, এর পরে আর ওর চোখ শুকনো রাখা দুষ্কর হয়ে উঠবে। বিল্ব কেমন করে বলল, সুমতি জারজ সন্তানের জননী হবে। ও কি বেশ্যা, না রক্ষিতা? বিশ্ব সংসারের কেউ না জানতে পারে, বিল্ব কি জানে না, সুমতি তার বিবাহিতা স্ত্রীর চেয়েও বড়। বিশ্বসংসারের লোকেরাই বা বাদ যাবে কেন। বাড়ির লোকেরা কি তখনো জানবে না, কার সন্তান ও বহন করছে? ছ বছর ধরে যে লোকটাকে নিয়ে সুমতির এত অপমান লাঞ্ছনা, প্রতি পায়ে পায়ে সন্দেহের সূঁচবিদ্ধ দৃষ্টি, প্রতিটি মুহূর্ত লুকিয়ে চুরিয়ে একটু সাক্ষাতের জন্য সঞ্চয় করা, এমন কি ওদের প্রতিবেশী, যারা জানে, ত্রৈলক্য পণ্ডিত স্ট্রীটের সেই বিল্ব ছেলেটার কাছে ওর ইহকাল পরকাল পোকা খেয়ে গিয়েছে, কারুরই কি বুঝতে কিছু বাকী থাকবে? তবু আইন জারজ ইত্যাদি প্রশ্ন কেমন করে তোলে বিল্ব? সুমতির অবিমৃশ্যকারিতার ভবিষ্যৎ পরিণতি বোঝাবার জন্যে? বিল্বর সন্তানের জননী হতে চাওয়া যদি অবিমৃশ্যকারিতা হয়, তা হলে গোটা জীবনটা কী? কী অর্থ বিল্বকে সর্বাংশে চাওয়া!

বিল্ব অবিশ্যি এ চাওয়ার কথাটা তুলতেই দেবে না. ও বলবে, সুমতির এটা আপাতত একটা ভাবপ্রবণতার জেদ মাত্র। কারণ, ওর মতে, এখনো সময় হয় নি। কবে সময় হবে সেই আশায় জীবনের এই একটা প্রথম বিস্ময়কর অনুভূতি থেকে সুমতি নিজেকে কিছুতেই

মুক্ত করতে পারছে না। হয় তো এটা সত্যি বিল্বর কাছে ভাবপ্রবণতা, কিন্তু সুমতির কাছে বিল্বর আর এক জীবনসত্তা তার রক্তে বীজের মতো নিহিত রয়েছে। যে বিল্বর জন্যে ওর দেহ মন এক অপরূপ চৈতন্যে নিরন্তর মগ্ন, সে রয়েছে ওর প্রাণের গভীরে। এ অনুভূতিটা ওকে কেমন যেন একটা তীব্র বেদনা মেশানো সুখী করে তুলছে, ওকে আশ্চর্য একটা শক্তি দিচ্ছে, মরিয়া করে তুলছে। বিল্ব বলল, তা হলে তোমার জেদটাই তুমি বজায় রাখতে চাইছ?

সুমতি বলল, আর তার জন্যে তোমাকে কোনরকম কষ্ট দিতে চাই না।

—অথচ এটা বুঝতে পারছ, এমন অবস্থা নয় যে, দুজনে মিলে আজ একটা সংসার পেতে ফেলতে পারি, তোমাকে নিয়ে চলে যাবার আর্থিক যোগ্যতা এ মুহূর্তে নেই।

—এ অবস্থা যদি চিরদিন চলে, চিরদিনই কি তা হলে এরকম চালিয়ে যেতে হবে?

—চিরদিনের কথা হচ্ছে না। আমি চিরদিনই বেকার থাকব না। সবকিছুরই একটা প্রস্তুতি চাই।

—সেটা তোমার এখন মনে হচ্ছে, কিন্তু সময় বিশেষে প্রস্তুতির কথা তুমি ভুলে যাও।

বিল্বর ভুরু কুঁচকে উঠল আবার। সুমতি এখন অন্ধকারে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে। সে যা বলতে চেয়েছে, বিল্ব নিশ্চয়ই তা বুঝতে পেরেছে। সে যদি প্রস্তুতির কথাই ভাববে তবে আজ সুমতি অন্তঃসত্ত্বা কেন? কিন্তু এটাও জানে সুমতি, বিল্বর কোঁচকানো ভুরু ক্রমেই সহজ হয়ে আসছে এবং ওর মুখে হাসি ফুটে উঠছে। শুধু তাই নয়, সুমতির কথা শুনে আবার ওর ভিতরটা আদর করবার জন্যে থরথরিয়ে উঠছে। আর ঘটলও ঠিক তাই। সুমতির হাত ধরে বিল্ব কাছে আকর্ষণ করল, মুখ কাছে নিয়ে এল। বলল, না, সত্যি তোমার সঙ্গে আমি কথায় পারব না সুমতি।

কিন্তু ঠোঁট ছোঁয়াবার আগেই সুমতি মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল, না।

অথচ 'না' বলার ইচ্ছে এখন একটুও ছিল না সুমতির। বিন্নর বুকের মধ্যেই নিজেকে গুঁজে দিতে ইচ্ছা করছে। ভবিষ্যতে সংসার করতে গেলে, প্রত্যহের মাঝে পড়ে, সুমতির কেমন লাগবে ও জানে না। কিন্তু এখন প্রতিটি মুহূর্তেই বিন্নর কাছে, পাশে পাশে, গায়ে গায়ে থাকবার আকাঙ্ক্ষায় ওর বুকের ভিতরটা ছিঁড়ে পড়তে চায় যেন। বিন্ন যে ওর সঙ্গে কথায় পেরে উঠছে না, এ কথা শোনা মাত্র বিন্নর আদর গ্রহণ করার জন্যে প্রতিটি রক্তকণা উন্মুখ। বিবাহিত জীবনের থেকেও ওর মনের বেড়িটা যে আরো অনেক নিবিড় এবং শক্ত। সম্ভবত বিবাহের ভেতর দিয়ে যে অনায়াস বেড়িটা আসে, সেটার মাধুর্য বেশিক্ষণ টেঁকে না। সেটা অনেকটাই সমাজ ও সংস্কারের মিলিয়ে দেওয়ার ব্যাপার, যৌবনকে সংহত করে একটি গার্হস্থ্য অনুশাসনের ছকে ঢালাই করা। আর এ ক্ষেত্রে, পারিবারিক প্রতিরোধ, অনেক অপমান লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সঙ্গে লড়াই করে, অনেকটা 'লাজ-কুল-মান' বিসর্জন দিয়ে বিন্ন একটি ধ্যান, একটি জ্ঞান। এমনকি মানুষের জগতের যেটা প্রায় সহজাত, প্রেম এবং যৌবনের সৃষ্টির ব্যাপারে চোখ কান খোলা রাখা, সুমতি সেদিক থেকেও অন্ধ। ওর বান্ধবীদের অনেকেরই চোখ কান খুব সজাগ। একটা ছেড়ে আর একটা ধরতে ওদের পক্ষে সুবিধে এই কারণে, কোথাও একেবারে সঁপে দিতে ওরা নারাজ। এক এক সময় সন্দেহ হয়, বিয়ের পরেও অনেকেই বিছানায় যাওয়া ছাড়া, আর সবটাই তুলে নেয়।

সুমতির অসুবিধে একাধিকের সুযোগটাই এল না জীবনে। বিন্ন ওর দরজা আগলে না দাঁড়িয়েও সকল দরজায় উপস্থিত।

বিন্ন হুস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। বলল, ঠিক আছে, তোমার কথাই থাক। তা হলে প্রথম কাজ, ইমিডিয়েটলি

রেজিস্ট্রেশনের নোটিসটা দিয়ে দেওয়া। আর দু' এক মাসের মধ্যেই যেমন করে হোক, তোমাকে নিয়ে আলাদা বাসায় চলে যাওয়া।

সুমতি কোন কথা বলল না, চুপ করে রইল। বিন্নর মুখটা দেখবার চেষ্টা করল। এবং আস্তে আস্তে বিন্নর জন্যে একটা কষ্ট বুকের মধ্যে টনটনিয়ে উঠল। সংশয় কেটে গিয়ে বারে বারেই মনে হতে লাগল, বিন্নকে দুঃখ দিচ্ছে ও। কিন্তু উপায় কী। বিন্ন যে ভাবে চায়, সব কিছু গুছিয়ে-গাছিয়ে, একটি নিটোল পাতা সংসারে গিয়ে ওঠা কী করে সম্ভব। অবিশ্যি, টিউশানি ছাড়া বিন্নর আর কোন রোজগারও নেই। সুমতির বি. এ. পাস করা আছে। সেও চাকরি একটা করতে পারবে ভবিষ্যতে। কিন্তু আপাতত বিন্ন চেয়েছিল, একটা চাকরি। তারপরে সংসারযাত্রা। সুমতির তাতে মন মানছে না।

সুমতি নিজেই এবার বিন্নর হাতটা নিজের হাতে টেনে নিল। বলল, রাগ করছ না?

বিন্ন বলল, ব্যাপারটা রাগের না, ভাববার। যা তুমি চাও, তা আমিও চাই। পদ্ধতিটা কেবল আলাদা।

সুমতি আরো নিবিড় হয়ে এল বিন্নর বুকের কাছে। বলল, আমার পদ্ধতিটা ভাবপ্রবণ, না?

বিন্ন জবাবে ঠোঁট নামিয়ে নিয়ে এসে একটু আদর করল, আর সুমতির মনে হল, না, জীবনে কোথাও ওর কোন বড় কথা নেই, আদর্শ নেই, বিন্নর বুকে পরম নির্ভরতায় চিরদিন কেবল আকাঙ্ক্ষিত হতে চায়।

পরদিনই বিন্ন সুমতির সঙ্গে এক জায়গায় দেখা করে, ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশনের নোটিসটা ওকে দিয়ে সই করিয়ে নিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাব করল, চল কয়েকদিন কোথাও ঘুরে আসি। আমার আর এখানে থাকতে ভালো লাগছে না।

সুমতি অবাক হয়ে বলল, সে কি, বাড়িতে কী বলে যাব?

—কেন, এখন তো কলেজ ছুটি। এর আগেরবার বান্ধবীদের সঙ্গে দীঘায় বেড়াতে যাচ্ছি বলে যেরকম দুজনে গিয়েছিলাম, সেরকম গেলে হয়।

সুমতির ভিতরটা ছটফটিয়ে উঠল, ব্যাকুল হয়ে উঠল যাবার জন্যে। অনেকদিন, দুজনে দুজনকে, কয়েকদিনের জন্যে নিবিড় করে কাছে পায় নি। জীবনে একবারই তেমন দিন এসেছিল। বান্ধবীদের সঙ্গে বেড়াতে যাবার নাম করে শিমুলতলায় বিল্লর এক বন্ধুর বাড়িতে ওরা সাতদিন এক সঙ্গে ছিল। ছ'বছরের মধ্যে, কখনো কোন দ্বিপ্রহরে কোন বন্ধুর অ্যাপার্টমেণ্টে, কখনো কম দামী হোটেল কর্নারে, নানান জায়গায়, দেখা করেছে, মিলেছে। মাত্র একবার এক সঙ্গে সাতদিন থাকতে পেরেছিল। তার জন্যে ভয় শঙ্কা ছিল সব সময়। তবু সেই দিনগুলো জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে যেন। আজ আবার সেই আহ্বান! যদিও জেল পালানোর মতোই ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তবু সুমতি রাজী হল। টাকার প্রশ্নটা উঠল, কেন বিল্ব এ সময়ে আবার এতগুলো টাকা খরচ করবে। বিল্ব জানালো, ব্যবস্থা করতে ওর কষ্ট হবে না।

তারপর কয়েকদিনের চেষ্টায় সুমতি সফল হল। দুজন বান্ধবীকে সাক্ষী দাঁড় করিয়ে পুরী যাবার অনুমতি পেল, যদিচ সেটা অনেক প্রতিবাদের ভিতর দিয়ে।

ব্যবস্থানুযায়ী বান্ধবীদের সঙ্গে ভোরবেলা ট্যাক্সি করে বেরুলো সুমতি। পথের মাঝে বান্ধবীদের বিদায় দিয়ে, বিল্ব এল ওর পাশে। কথা ছিল, শিমুলতলাতেই যাবে ওরা। কিন্তু বিল্বর নির্দেশে গাড়ি হাওড়ায় গেল না, উঠল ওর এক বন্ধুর নার্সিংহোমে।

বিস্ময়ে, ভয়ে, রাগে, অপমানে, সুমতি একটা প্রবল চীৎকার করে পালিয়ে আসতে চেয়েছিল। বিল্ব ওর হাতে পায়ে ধরে, নানানভাবে বুঝিয়েছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল বিল্বর ডাক্তার বন্ধু। তবু সমস্ত ব্যাপারটা এত কুৎসিত বলে মনে হয়েছিল, এমন নোংরা ছলনায় পরিপূর্ণ, ওদের সামনে কাঁদতে পর্যন্ত পারে নি সুমতি। বুঝে নিয়েছিল, জীবনের ছটা বছর ও কার সঙ্গে কাটিয়েছে, ওর ভবিষ্যৎ পরিণতিই বা কী। এই কথা ভেবেই ও আর আপত্তি করে নি। যে এভাবে মিথ্যে কথা বলে নার্সিংহোমে এনে তুলতে পারে, তাকে সারাজীবন ধরে বিশ্বাস করবার কোন হেতু নেই।

তারপর যা হবার তাই হল। সুমতি নিজেকে সমর্পণ করে দিল অপারেশনের টেবিলে। সময় তখনো যথেষ্টই হাতে ছিল, দু মাসও পূর্ণ হয় নি। তিন দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল ও। কিন্তু ওর চেহারাটা গেল একেবারে বদলে। সেটা যে কেবলমাত্র অসুস্থতা তা নয়। ডাক্তার বরং ওর দেহ ও চোখ মুখ থেকে অসুস্থতার ছাপটাকে একেবারে অপসারণ করারই চেষ্টা করেছে; তবু মুখ দেখে মনে হল, এ অন্য কোন সুমতি, যার কালো চোখের চকিত চঞ্চলতার জায়গায় স্থান নিয়েছে একটি স্থির ভাবলেশহীন তা। যে কোন একদিকে তাকিয়ে থাকে, এবং ভয় হল, ওর জিভ গিয়েছে আড়ষ্ট হয়ে, কোনদিন কথা বলতে পারবে না। কারণ এক কথাও আর বলে নি।

বিল্ব নার্সিংহোম ছেড়ে কয়েকদিন কোথাও নড়ে নি। ও নিজেই ছিল সুমতির নার্স, প্রতিটি মুহূর্ত সুমতির বেড-এর পাশে। ওষুধ দেওয়া থেকে খাওয়ানো, সবই করেছে। অনেকবার কথা বলবার চেষ্টা করেছে, সুমতিকে কথা বলাতে পারে নি। সুমতির হাত ধরেছে, গায়ে হাত দিয়েছে। সুমতি বাধা দেয় নি, যেন দেহটা ওর নয়।

পাঁচদিন পরে মুখে স্নো পাউডার মেখে, চুল বেঁধে নেওয়ায় মুটি বেশ পরিচ্ছন্ন এবং তাজা দেখাল সুমতিকে। যদিও ক্লান্তির ছাপটা একেবারে যায় নি। কিন্তু যাবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত। কারণ সুমতি বেশ সুস্থই আছে এখন।

আরো দুদিন পরে, সুমতির ফিরে যাবার দিন এল। বিশু নিজের হাতেই সবকিছু গুছিয়ে দিল। ডাউন পুরী এক্সপ্রেসের সময় ধরে, সমস্ত ব্যবস্থা হল। সুমতির মেকআপ হিসেবে, সাজো-গোজো বেশবাস সমস্ত নিখুঁতভাবে করা হল। তবু শেষ কথা কয়টি বলবার জন্যেই বিশু ডাক্তার বন্ধুর শোবার ঘরে ওকে ডেকে নিয়ে গেল। সুমতির কোন কিছুতেই আপত্তি নেই। যা বলা, তাই সে শুনে যাবে।

ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বিশু বলল, আমি জানি তুমি হয়তো আর আমাকে কখনো বিশ্বাস করতে পারবে না।

সুমতি নীরব। বিশু আবার বলল, সেটা খুবই স্বাভাবিক। তবু তোমাকে একটা কথা বিশ্বাস করতে বলব, সুমি, আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানি না। তুমি আমাকে আর কয়েকটা মাস সময় দাও। অবিশ্যি জানি, আমার এই কথায়ও তোমার বিশ্বাস নেই, তবু—তবু—সুমি বিশ্বাস কর, যা হোক একটা কথা বল।

সুমতি একটি কথাও বলল না। হাত তুলে কেবল নিজের ঘড়িটা দেখল, যার মানে বলতে চাইল, সময় হয়েছে, এবার যাওয়া দরকার।

—আমার দিকে একবার তাকাবেও না?

বিশু বলল প্রায় রুদ্ধ গলায়। ওর চেহারাটাও শীর্ণ হয়েছে এ কদিনে। চোখের কোলে গভীর পরিখা। দেখলেই বোঝা যায় কিছুদিন প্রায় অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় কেটেছে। ও আর একবার ডাকল, সুমি, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ, তুমি—।

সহসা। মনে হল, সুমতির শরীরটা একবার কেঁপে উঠল। ও মুখ ফিরিয়ে বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বিশ্ব সহসা হাত বাড়িয়ে টেলিফোন রিসিভার তুলে ডায়াল করতে করতে বলল, একটু দাঁড়াও সুমি।

তারপরে ফোনে বলল, হ্যালো—নম্বর? আচ্ছা, শিবশঙ্কর চ্যাটার্জি আছেন? কথা বলছেন? আমি বিশ্ব কথা বলছি। শুনুন, আপনার মেয়ে সুমতি পুরী যায় নি, ও আমার কাছেই আছে।...হ্যাঁ, রেগে যাবেন না, শুনে নিন, আমরা বিয়ে করেছি, আমরা এক সঙ্গেই বাস করছি। তাই ও আর ফিরে যাবে না। মাপ করবেন, ঠিকানাটা এখন বলতে পারব না।...পুলিসে খবর দেবেন? দিন, তাতে কিছু সুবিধে করতে পারবেন না, আচ্ছা.....

কথা শেষ করবার আগেই বিশ্ব দেখল, সুমতি বন্ধ দরজার গায়ে মুখটা গুঁজে দিয়েছে। ওর সর্বাঙ্গ কাঁপছে, পড়ে যাবে এখনি। রিসিভারটা রেখে দিয়ে ছুটে গিয়ে সুমতিকে বুকের কাছে টেনে নিল। দেখল, সুমতি সেই অবস্থাতেই জলভরা চোখে বিশ্বর দিকে তাকিয়ে আছে। ও মূর্ছা যায় নি। এবং সাতদিন পরে এই প্রথম সুমতি বিশ্বর চোখের দিকে, মুখের দিকে তাকাল। বিশ্ব সুমতির মুখখানি দু-হাত দিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ফেলল। তখন ওর চোখেও জল। মুখ নামিয়ে বারে বারে আদর করল সুমতিকে। সুমতি তখন সাতদিনের জমানো কান্নাটা শেষ করছিল।

অনেকক্ষণ পরে সুমতি বলল, উঃ, তোমার সব ব্যাপারটাই এমন আচমকা আর ভয় ধরিয়ে দেওয়া, কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু এটা কি হল?

বিশ্ব বলল, হল এই, তোমাকে হারাচ্ছিলাম, আর হারাব না।

সুমতি ওর কালো চোখের কোণে তাকাল, বলল, তা এই ভাবে?

—আর কোন উপায় ছিল না, সুমি।

—কেন?

—তোমার একটা কথা আমার বোঝা উচিত ছিল। সব দিক সামলে গুছিয়ে গাছিয়ে জীবনে কিছু করা যায় না। জীবনটা একটা চলমান স্রোত, ভেবে চিন্তে প্রস্তুত হয়ে তাতে ঝাঁপ দেওয়া যায় না, সে আপন মনে চলছেই। অতএব যা আসে, তা নিয়ে চলতে থাকি।

সুমতি গভীর চোখে বিল্বর চোখের দিকে তাকাল। বলল, রাগ করছ?

বিল্ব আদর করে তার জবাব দিল।

সুমতি বলল, কষ্ট হচ্ছে, না?

আরো নিবিড় করে সুমতিকে জড়িয়ে নিল বিল্ব। হাসতে হাসতেই সুমতির চোখের জল ছাপিয়ে এল। বলল, তবে আর এখানে নিয়ে এসেছিলে কেন?

—তখন যে অন্য রকম ভেবেছিলাম। ভুল হয়েছে সেটা। কোন কিছুর জন্যেই তোমাকে হারাতে চাই নি।

সুমতি অনেকক্ষণ বিল্বর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর নিজেই বিল্বর মাথাটা কাছে টেনে নিল। বলল, আমাদের বাড়িতে না জানি কী হুলস্থুলটা হচ্ছে।

বিল্ব বলল, সে একটু হবে। তার চেয়ে ভাবা দরকার, দুজনে এখন কোথায় গিয়ে উঠব।

সুমতি হেসে ফেলল। বলল, সত্যি, তোমার সবটাই এমন অদ্ভুত, বুঝতে পারি না। এই এক রকম, পরমুহূর্তে আর এক রকম।

—জীবনটা কি তাই নয় সুমি?

সুমতি নিরুত্তর, স্নিগ্ধ, পরম নির্ভরতার হাসি নিয়ে তাকিয়ে রইল। ভাবল, বিল্বটা যে এই রকমই, অচেনা জীবন যেমন বিচিত্র ও আকস্মিক ছন্দে চলে, ও ঠিক তেমনি। জীবনের ও একটা প্রতিরূপ মাত্র, ও একটা বাঁধাধরা ছকের 'ছোকরা' নয়। ওর মধ্যে

সংশয়, অসংশয়, ভয় ও নির্ভয়, সুখ ও দুঃখ, জীবনের বেগেই খেলা করে। কে জানে, ওর জন্যে আরো কি বৈচিত্র্য বন্ধুরতা অপেক্ষা করছে সুমতির জীবনে। তবু সেটাই জীবন, বিল্বই জীবন। তার কাছে কোন নিশ্চিত আশ্বাস নেই। প্রতি মুহূর্তটাই তাই বাঁচার কথা ভাবা যাবে।